সি পি আই (এম) এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে

৩

জ্যোতি বসুর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

এক অতুলনীয় কমিউনিস্ট

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

জ্যোতি বসুর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি
এক অতুলনীয় কমিউনিস্ট

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৪

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ○আগরতলা

এই পুস্তিকায় যা আছে :

১। প্রকাশ কারাত/ এক অতুলনীয় কমিউনিস্ট নেতা-৩
২। প্রণব মুখোপাধ্যায়/ জনপ্রিয়তা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও দেশপ্রেম জ্যোতি বসুকে জীবিতকালেই কিংবদন্তী করে তুলেছিল - ৬
৩। জ্যোতি বসু / (ক) আমার ছেলেবেলায়-৮ (খ) ফেলে আসা দিনের কিছু কথা-১৫ (গ) ভারতীয় গণতন্ত্র ও বামপন্থীদের অভিজ্ঞতা-২৬ (ঘ) স্বাধীনতার ৬০ বছর ও বামপন্থীরা: কিছু ভাবনা-৩৬

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

দাম : ৩০ টাকা

এক অতুলনীয় কমিউনিস্ট নেতা

প্রকাশ কারাত

গত ১৯ই জানুয়ারি কমরেড জ্যোতি বসুর শেষ যাত্রার দিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সামিল হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কমরেড জ্যোতি বসু, যিনি বরাবর মানুষের সঙ্গে থেকেছেন ও তাঁদের স্বার্থে লড়াই করেছেন, তিনি যে মানুষের কত প্রিয় নেতা ছিলেন, মানুষই সেদিন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। কীভাবে কমরেড জ্যোতি বসু এমন জননেতা হয়ে উঠলেন? তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই মানুষ তাঁকে অনন্য নেতার আসনে স্থান দিয়েছেন।

প্রথমত, কমিউনিস্ট দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কোন দিন আপস করেননি কমরেড জ্যোতি বসু। তিনি ৫৫বছর বিধাসভার সদস্য ছিলেন, দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য সরকারকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই দীর্ঘ পর্বে তিনি বিধানসভায় ও রাজ্য সরকারে তাঁর উপস্থিতিতে শ্রমিক, কৃষক, বিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মচারী ও সমস্ত শ্রমজীবী মানুষসহ জনগণের জন্য লড়াই সংগ্রাম চালাতে ব্যবহার করেছেন। মানুষের চোখে কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন তাঁদের দাবি ও অধিকার আদায় ও রক্ষার লড়াইয়ের শীর্ষ নেতা। তাঁরা জানতেন, কমরেড জ্যোতি বসু এমন একজন নেতা, যিনি কখনও বুর্জোয়া ও শাসকশ্রেণির স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না।

দ্বিতীয়ত, কোন রাজ্য কোন সরকারের আর কোন নেতা শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা বদলানোর জন্য এত কিছু করেননি। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ক্ষেতমজুরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জমি ও জমির অধিকারের নিরাপত্তা, নেতৃত্ব দিয়েছেন কমরেড জ্যোতি বসু। ঐ রাজ্যে হাজার হাজার শ্রমিককে শ্রম আইন যথাযথভাবে রূপায়ণের মাধ্যমে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, নেতৃত্বে থেকেছেন তিনি। তাঁর ২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে রাজ্যের সংখ্যালঘুরা অনুধাবন করেছেন, তাঁরা নিরাপদ। রাজ্যে অটুট থেকেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও।

তৃতীয়ত, একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে কী কাজ করা সম্ভব আর কী সম্ভব নয়, মানুষকে সেই সত্য স্পষ্ট ভাষায় বলে তিনি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধতার কথা তিনি ধারাবাহিকভাবে বলে গেছেন এবং পাশাপাশি সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে যা করা সম্ভব, তা নির্দিষ্ট করে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার লক্ষ্য

ঠিক করেছেন। এইভাবেই তিনি মানুষকে তাঁদের জীবনযাত্রা বদলের লড়াইয়ে যুক্ত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের কাছে কিছু সীমিত রিলিফ পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কত কি পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কোন মোহ তৈরি হতে দেননি। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা। এইসব কারণেই মানুষের কাছে তিনি এক অনন্য নেতা, সাধারণভাবে 'রাজনীতিক' বলতে যা বোঝায় তা নয়।

কমরেড জ্যোতি বসুর জীবনাবসানের পরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। কমরেড জ্যোতি বসু কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও মহান নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক হয়ে উঠেছিলেন, এমন বোঝানোর চেষ্টাও হয়েছে। কেউ কেউ দাবি করেছেন, কমরেড জ্যোতি বসু অসাধারণ নেতা হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তিনি তার পার্টি ও কমিউনিস্ট মতাদর্শকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

এসব কথা বলা মানে কমরেড জ্যোতি বসুকে অসম্মান করা। কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই ফসল। ১৯৪০ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার সময় থেকে তাঁর সাত দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি সংগঠিত করেছেন রেল শ্রমিকদের, সংগঠিত করেছেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিরও সংগঠক ছিলেন। সারা জীবন তিনি লড়াই করেছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন এক অসাধারণ বিধায়ক। কারণ, কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি জনগণের লড়াই-সংগ্রাম ও সংসদের বাইরের আন্দোলনের জন্য সংসদীয় মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন। কমরেড জ্যোতি বসু বামফ্রন্ট সরকারের অসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কারণ বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে সরকার পরিচালনা করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে সি পি আই (এম)'র বোঝাপড়াকে তিনি সব থেকে বেশি কার্যকারীভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

এই আমাদের কমরেড জ্যোতি বসু, কমিউনিস্ট নেতা, যিনি জনগণের স্বার্থ এবং শ্রমিকশ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই লড়াই করেছেন সারা জীবন। এই কমরেড জ্যোতি বসুর জীবনাবসানে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারত শোকাহত। মানুষের চোখে তিনি অতুলনীয় কমিউনিস্ট নেতা।

যে পৃথিবী দেখতে চাই

দেশের উন্নতি নিয়ে কোনো কল্পনাবিলাস আমার কাছে অর্থহীন। আমার আগ্রহের বিষয় হলো, বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার পটভূমিতে পরবর্তী সহস্রবর্ষের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডে আমরা কিভাবে নিজেদের যুক্ত করছি। একজন মার্কসবাদী হিসাবে এ-কথা আমি বলতে চাই যে, ধনতন্ত্রই মানবসভ্যতার শেষ কথা নয়। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা তাকিয়ে থাকব এক সমাজবাদী, অত্যাচারমুক্ত, মানবধর্মী সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের আশায় যা হবে সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায়। যে সমাজবাদী সমাজব্যবস্থার আমরা মুখোমুখি হব, সেখানে শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হবে না, সেখানে সৃষ্টি হবে নতুন মানুষের এবং মহত্তর মানবসভ্যতার যেখানে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং চিন্তাই প্রাধান্য পাবে। অসমাপ্ত কাজকে শেষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এইরকম একটি সমাজের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

(১৯৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর দিল্লিতে ৩০তম জওহরলাল নেহরু স্মারক বক্তৃতা থেকে ঃ মূল বক্তৃতা ছিল ইংরেজী ভাষায়) জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ঃ পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮২]

জনপ্রিয়তা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও দেশপ্রেম

জ্যোতি বসুকে জীবিতকালেই কিংবদন্তী করে তুলেছিল

প্রণব মুখোপাধ্যায়

নিজাম প্যালেসের সেই ৪ নম্বর ঘরের স্মৃতিটা আজও বেশ উজ্জ্বল। সেটা প্রথম যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার সময়। যুক্তফ্রন্টের নেতাদের বৈঠক বসত সেখানে। শলাপরামর্শ হত। রণনীতি স্থির হত। প্রথম যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি ও উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরোধ কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি তখন উত্তপ্ত। জ্যোতি বসুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় সেই ৬৭-এর সময় থেকে। ফ্রন্টের সিদ্ধান্তে' ৬৯-এ ও'র সঙ্গে প্রচারসভা করেছি। এতদিন পর সভাগুলির জায়গা মনে নেই। তবে বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরতে হয়েছিল। জ্যোতি বসুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সেটা প্রথম পর্ব। পূর্ণ পরিচয় পাওয়া শুরু ১৯৭৭ থেকে। আমি তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী, উনি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ থেকে ওর দূরদৃষ্টি ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সম্ভবত সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়, তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করা যায় যোজনা কমিশনের নেতার চেয়ার থেকে। তার আগে ৭০ দশকের গোড়ায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের সদস্য হিসেবে দিল্লিতে ও'কে খুব কাছ থেকে দেখেছি। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর বন্ধুর সম্পর্ক ছিল। দু'জনে দু'জনকে নাম ধরে ডাকতেন। কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে ফোনে কথা বলতেন, দেখাও করতেন। এর'পর রাজনৈতিক সঙ্ঘাতের যুগ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কেন্দ্র করে। বিরোধ সত্ত্বেও দু'জনই ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হতে দেননি। দীর্ঘমেয়াদ মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন জ্যোতিবাবু। রেকর্ড গড়েছেন। কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী পদে থাকার সময় আমি বিভিন্ন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। জ্যোতি বসুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা কথা জোরের সঙ্গে বলতে হয়, উনি বাংলাকে ও'র দলের দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ও'র তুলনায় যাচ্ছি না, জ্যোতিবাবুর মতো বর্ণময় নেতা বেশি হয় না। ও'র ব্যক্তিত্বকে ভাল না বেসে উপায় নেই। বিরোধী নেতা হিসেবে দেখেছি ও'কে অসামান্য ভূমিকায়।

সংসদীয় রাজনীতিতে ও'র ভূমিকাকে শ্রদ্ধা করি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসেবেও উনি আমাকে আকৃষ্ট করেন। আমাদের প্রথম ইউ পি এ সরকারের স্থপতি জ্যোতি বসু। পরে বামেরা ও'র সেই স্থাপত্যকে ভাঙতে চেয়েছেন। যদিও তাঁর অবস্থানে বিরোধী নেতা হিসেবে, তবু একের পর এক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর সুসম্পর্ক অক্ষুন্ন থেকেছে। শুধু ইন্দিরা নন, রাজীব গান্ধী, পি ভি নরসিংহ রাও, মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল অতুলনীয়। আমি বলব, জ্যোতি বসু একটা নবযুগের স্রষ্টা, নিজেই একটা নবযুগ। তাঁর মৃত্যুতে সেই যুগের শেষ হল। আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ীকে। জনপ্রিয়তা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও দেশপ্রেম জ্যোতি বসুকে জীবিতকালেই কিংবদন্তী করে তুলেছিল।

আমার ছেলেবেলায়
জ্যোতি বসু

আমার বয়স এখন ৯৫ চলছে। ছেলেবেলার সব কথা এখন মনে না পড়াটাই স্বাভাবিক। গত ৬৮ বছর ধরে আমি কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। যদিও অল্পবয়সে এখানে স্কুল-কলেজের পাট চুক্‌লে আমার বাবা আমাকে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে এসে প্র্যাকটিস্ শুরু করুক, রোজগার করুক।

কিন্তু বিলেতে থাকতেই আমি মার্কসবাদে আকৃষ্ট হই এবং গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় কাজ করা শুরু করেছিলাম। লন্ডনে থাকতেই আমি, ভূপেশ, এরকম আরো কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে দেশে ফেরার পর সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী হিসাবে কাজ করবো। ১৯৪০ সালে বিলেত থেকে জাহাজে করে বোম্বাইতে নেমেই প্রথমে যোগাযোগ করেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে। কলকাতায় ফেরার পর কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ দেন। তখন থেকেই সবসময়ের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কাজ করা শুরু করেছি।

স্বাভাবিকভাবেই আমার বাড়ির কেউ এই সিদ্ধান্তে খুশি হননি। আসলে রাজনীতির সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনও যোগাযোগ ছিল না। বাবা ডাক্তারি করতেন, দুই জ্যাঠামশাই করতেন ওকালতি। বাবা অবশ্য রাজনীতি করার বিরুদ্ধে ছিলেন না। সেদিক থেকে তিনি উদার ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে ব্যারিস্টারি করেও কেন রাজনীতি করা যাবে না? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তো দু'টোই একসাথে করছেন, তাহলে আমি পারবো না কেন? সেজন্য কতকটা বাড়ির চাপেই আমি ব্যারিস্টার হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে নামও লিখিয়েছিলাম। কিন্তু প্র্যাকটিস্ করিনি কোনোদিনই। কারণ তখন তো সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

মেয়েদের স্কুলে একা

আমাদের পৈত্রিক বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বারদিতে। যদিও আমার জন্ম কলকাতার হ্যারিসন রোডের একটি বাড়িতে, এখন যার নাম মহাত্মা গান্ধী রোড। অবশ্য

আমার ছোটবেলায় অনেকদিন পর্যন্ত কেটেছে হিন্দুস্থান বিল্ডিঙে। ধর্মতলায় বাড়ি, বাবা আমাকে ভর্তিও করলেন ধর্মতলারই লরেটো কিন্ডারগার্টেনে। তখন আমার ছ'বছর বয়স। কিন্ডারগার্টেনে চার বছরের কোর্স। কিন্তু আমি একটা ডাবল্ প্রোমোশন পেয়ে গেলাম। তিন বছরে উঠে এলাম ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে। কিন্তু এবারই হলো মুশকিল। ধর্মতলা লরেটো তো ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে। কিন্তু এবারই হলো মুশকিল। ধর্মতলা লরেটো তো ফাস্ট স্ট্যান্ডার্ড থেকে সম্পূর্ণ মেয়েদের স্কুল। অন্য স্কুলে যেতে হবে। বাবা চেষ্টা করলেন সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করাতে, কিন্তু ওখানে তখন সে বছরের মতো অ্যাডমিশন ক্লোজড্। মিডলটন রোডের লরেটোতে গিয়েও ফিরে আসতে হলো। ওখানেও ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে ছেলেদের নেওয়া হয় না। অগত্যা ফিরে আসতে হলো ধর্মতলা লরেটোতেই। মাদার ইন-চার্জ আমার অবস্থাটা বুঝে রাজি হলেন ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে ওখানেই পড়তে দিতে। বাবা বললেন, শুধু শুধু একটা বছর নষ্ট হবে কেন? ওখানেই পড়ো। যাই হোক, সেবছর ওই ক্লাসে আমিই ছিলাম একমাত্র ছেলে, বাকি সবাই মেয়ে। পরের বছর সেন্ট জেভিয়ার্সে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে ভর্তি হলাম। এবার আর ভুল হয়নি, বাবা আগেই নাম লিখিয়ে রেখেছিলেন।

বাংলা নিয়ে বিভ্রাটে

মিশনারীদের স্কুল সেন্ট জেভিয়ার্সে তখন বাংলা পড়ানোই হতো না। ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তো ইংরাজী আছেই, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নিতে হতো ল্যাটিন, হিন্দি, এইরকম কিছু। আমি নিয়েছিলাম হিন্দি। তখন তো কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সমস্যায় পড়লাম সিনিয়র কেম্ব্রিজ (নাইনথ্ স্ট্যান্ডার্ড) পাশ করার পর। ইন্টারমিডিয়েটে বাবা আমাকে বললেন, বাংলা নিয়ে পড়তে হবে। তখন যিনি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, তিনি বাবাকে বলেছিলেন, ও এবার বাংলা নিয়ে পড়তে পারে। এখন বাংলা তো নেওয়া হলো, কিন্তু আমি খুবই টেনশনে পড়ে গেলাম। বাবা আগেই বলে রেখেছিলেন, আই এ এবং বি এ-তে ভালোভাবে পাশ করলে বিলেতে পাঠাবেন। সেজন্য সব সাবজেক্টেই পাশ করতে হবে, একটাতেও ফেল করা যাবে না। তাহলেই বিলেতে যাওয়া পন্ড হয়ে যাবে। আর বাড়ির সবারই ইচ্ছে ছিল, আমার নিজেরও খুবই ইচ্ছা ছিল যে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়বো। অতএব বাংলায় সর্বক্ষণের একজন মাস্টার এলেন। আমিও অন্যান্য বিষয়ের থেকে বাংলায় সব থেকে বেশি জোর দিলাম। যাইহোক আই এ-তে ভালোভাবেই পাশ করলাম। সেদিন এটা আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এখন অনেক বাবা-মা নাকি ছেলে-মেয়েদের বাংলা পড়াতেই চান না। আমার নাতিও লা মার্টিনিয়ার্স-এ পড়ে। ওই আমাকে বললো, ওদের স্কুলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে বাংলা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও অধিকাংশই নাকি হিন্দি নিয়েছে। বাংলা নাকি পরে পড়বে। অবাক কান্ড!

স্কুলে কেন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে

১৯৩০-৩১ সাল হবে। সেন্ট জেভিয়ার্সে আমি তখন এইটথ্ স্ট্যান্ডার্ডের ছাত্র। গোটা বাংলা জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক জোয়ার চলছে। আমাদের পরিবারে কেউ তখন সরাসরি রাজনীতি না করলেও স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবীদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা ছিল, তার পরিচয় নানাভাবে পেয়েছি। মা'র কাছেই শুনেছি, দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী মদনমোহন ভৌমিক আমাদের বারদির বাড়িতে অস্ত্রসহ বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। এসবের একটা প্রভাব মনের মধ্যে পড়েছিল। যাইহোক, ওইসময় একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলাম চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে অস্ত্রাগার দখল করেছেন। সশস্ত্র ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে অসীম সাহসী লড়াই চালাচ্ছেন সহায়-সম্বলহীন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা। মনে নাড়া দিয়েছিলো এই ঘটনা। আমাদের স্কুলে তো কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি যে বাঙালী যুবকরা একাজ করেছে। পরে নিঃসংশয় হওয়া গেলো যে এটা তাঁদেরই কাজ। সেন্ট জেভিয়ার্সের ফাদাররা এই ঘটনার নিন্দা করে তখন লিফলেট দেন। লিফলেট বিলির সময় আমি প্রতিবাদ করি। আমি বললাম, ওঁরা দেশের জন্য কাজ করছেন। স্কুল যেন ওঁদের বিরুদ্ধে লিফলেট দেবে? কিন্তু আমার অবাঙালী, বিশেষ করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বন্ধুদের একথা পছন্দ হলো না। তাদের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি -বচসা হলো।

পালানো মানে ভয় পেয়েছি

১৯৩০ সালের শুরুতে হবে, একদিন শুনলাম গান্ধীজী অনশন শুরু করেছেন। মনটা কেমন ভার লাগলো। বাবাকে বললাম, আজ স্কুলে যাবো না। বাবা আপত্তি করলেন না। বাবার সঙ্গে চলে গেলাম তাঁর চেম্বারে। ওই সময়েই একদিন শুনলাম সুভাষচন্দ্র বসু অক্টরলোনি মনুমেন্টের (এখনকার শহীদ মিনার) সামনে ভাষণ দেবেন। আমি আর আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই ঠিক করলাম, আমরাও যাবো। তখন খদ্দর পরতাম না। কিন্তু সেদিন একটা আবেগ পেয়ে বসলো। দু'ভাই খদ্দর পরে গিয়ে দেখি সে এক যেন রণক্ষেত্র। চারদিকে ঘোড়সওয়ার, লাঠিধারী পুলিশ, সার্জেন্ট কিছুক্ষণের মধ্যেই সার্জেন্টরা লাঠি চালাতে শুরু করলো, চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি, আমরা দু'ভাই ঠিক করলাম — পালাবো না। পালাবো কেন? পালানো মানে ভয় পেয়েছি। আমাদের গায়েও লাঠির ঘা পড়লো। আমরা দ্রুত হেঁটে বাবার চেম্বারে চলে এলাম। কিন্তু কাউকে কিছু বললাম না। বাড়িতে এসে শুধু মাকে বলতে মা চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিলেন। সেটাই ছিলো ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ।

বিপ্লবীদের পাশে

আমার জ্যাঠামশাই নলিনীকান্ত বসু তখন হাইকোর্টের বিচারপতি পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মেছুয়াবাজার বোমা মামলার বিচারের জন্য ব্রিটিশ সরকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলো ওই সময়। জ্যাঠামশাইকে ওই ট্রাইব্যুনালের জজ করা হলো। কিন্তু জ্যাঠামশাই যে স্বদেশীদের বিচার করতে বসেছেন, এটায় আমাদের বাড়ির কারও সায় ছিলো না। আমি আর আমার এক জ্যাঠতুতো দাদা দেবপ্রিয় বসু একটা ফন্দি আঁটলাম। দু'জনে বাড়ির বাইরে একটা জায়গায় গিয়ে ইংরাজীতে চিঠি টাইপ করলাম। তাতে লেখা হলো, "আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি বাঙালী হয়ে যাঁরা দেশভক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এটা গুরুতর অন্যায়। আপনার জীবন বিপন্ন হবে।" জ্যাঠামশাই যেদিন চিঠিটা পেলেন সেদিন রাতে খেতে বসার সময় দেখলাম বড়দের মুখ গম্ভীর। বাবা-মা খুবই চিন্তিত। বাবা মাকে নিচু গলায় বলছেন, দাদাকে বারণ করেছিলাম, শুনলেন না। এদিকে আজ চিঠি পেয়েছেন, ওর জীবন বিপন্ন। বাড়িতে গার্ড বেড়ে গেলো, মর্নিংওয়াক বন্ধ। বাবা এবং জ্যাঠামশাইয়ের বাজার করার খুব শখ, এক সঙ্গেই যেতেন। তাও বন্ধ হয়ে গেলো।

'পথের দাবি'

ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। আই এ পাশ করার পর ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে। আমাদের কলেজের কয়েকজন শিক্ষক এতো ভালো পড়াতেন যে তাঁদের কথা আজো মনে আছে। অনার্সের টিচার ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। চমৎকার শেক্সপিয়ার পড়াতেন। সুবোধ সেনগুপ্ত, অপূর্ব চন্দ-ও ইংরাজী পড়িয়েছেন। জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষও খুব ভালো ইংরাজী পড়াতেন। উনি পড়ে রাজনীতিতেও এসেছিলেন। আমার কাছে এসে একদিন বললেন, ফরওয়ার্ড ব্লক আমাকে বিধানসভায় প্রার্থী হতে বলেছে। আমি বললাম, সে কি! আপনি তো কোনোদিন রাজনীতিই করেননি! যাই হোক, উনি পরে এম এল এ হয়েছিলেন।

সুবোধ সেনগুপ্তের ক্লাসও ছিল মনে রাখার মতো। উনি আমাদের 'এ টেল অব টু সিটিজ' পড়িয়েছিলেন। আমার মনে আছে, ডিকেন্স পড়াতে গিয়ে উনি একবার আমাদের 'পথের দাবি' রেফার করেছিলেন। সেই সময় আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল। কারণ, 'পথের দাবি' তখন ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছাত্রদের নিষিদ্ধ বই পড়ার কথা বলছেন, এটা তখন উল্লেখ করার মতো ঘটনা ছিল। ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে 'পথের দাবি' পড়ার আগ্রহ দেখলাম। আমি অবশ্য আগেই এই বই পড়ে ফেলেছিলাম। জ্যাঠামশাই ট্রাইব্যুনালের জজ হওয়ার পর

পুলিস রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য হওয়ার অভিযোগে গাদা গাদা বাজেয়াপ্ত বই তাঁর কাছে পাঠাতো। সেগুলো জ্যাঠামশাই-এর টেবিলে সাজানো থাকতো। উনি ট্রাইব্যুনালের কাজে কোর্টে গেলে আমরা সেগুলো দেখতাম। পড়া হয়ে গেলে আবার সাজিয়ে রাখতাম। এইভাবে অনেক নিষিদ্ধ রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পড়া হয়ে গিয়েছিল। 'পথের দাবি'-ও এভাবেই পড়েছিলাম। খুবই ভালো লেগেছিল। ছোটবেলা থেকেই আমার নভেল পড়ার অভ্যাস। বাংলা, ইংরাজী সাহিত্যের গল্প-উপন্যাস সময় পেলেই পড়ি। তবে এখন আর এতটা পারি না। প্রতিদিন সকালে ৭-৮টা কাগজ তো পড়তেই হয়।

আমি তো মোহনবাগান

টেলিভিশনে চীনের অলিম্পিক দেখছিলাম। উদ্বোধন,ব্যবস্থাপনা,খেলা-ধূলা সমস্ত দিক থেকেই চীন পৃথিবীর নজর কেড়েছে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা খুব একটা ভালো করতে পারছিল না দেখে মনটা বারেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। তবু পরে যাহোক আমরা কিছু অন্তত পদক পেয়েছি।

আর এখন তো খেলা-ধূলার চর্চাও কমে গেছে। টিভি-তে, খবরের কাগজে দেখি খালি ক্রিকেট নিয়েই যত আলোচনা। আমার বাড়িতে যিনি থাকেন, ওঁর মেদিনীপুরে বাড়ি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতেও বললেন, গ্রামের দিকে ফুটবল খেলা খুবই কম হচ্ছে। অথচ আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন সব জায়গাতেই ফুটবল খেলা হতে দেখতাম। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব ছিল। আর আমি তো 'মোহনবাগান'। আমাদের সময় তখন অধিকাংশই মোহনবাগানের সমর্থক ছিলাম। ওরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে ফুটবল খেলে দেখিয়ে দিয়েছিল। তখন এই ঘটনা আমাদের মধ্যে খুবই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

অবশ্য মহামেডান স্পোর্টিং-ও তখন উঠতি ক্লাবের মধ্যে ছিল। আমি তো গোষ্ঠ পাল, উমাপতি কুমারের খুবই ফ্যান ছিলাম। কুমারবাবু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলতেন। গোষ্ঠ পালের সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাতে আলাপ হয়নি। তবে আমরা যখন সরকারে এলাম, তখন গোষ্ঠ পালের মূর্তি আমাদের সরকার ময়দানে বসিয়েছে। কুমার বাবুর সঙ্গে পরে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে একবার বিধানসভাতেও এসেছিলেন।

'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট'

আমরা তখন হিন্দুস্তান পার্কের বাড়িতে উঠে এসেছি। ১৯২৪-২৫ সাল হবে। তখন

ওখানে চারদিকে ধানক্ষেত আর ফাঁকা জমি। নারকেল গাছ, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ডোবা। রাস্তাঘাট নেই, গাড়ি থেকে নেমে অনেকটা হেঁটে বাড়ি। ট্রাম লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ওখানে আমাদের বাড়ির পাশেই একটা ফাঁকা জমি ছিল। এলাকার ছেলেদের নিয়ে একটা ক্লাব তৈরি করলাম। নাম দিলাম **'ব্ল্যাক অন্ড হোয়াইট'।** আমাদের জার্সির রঙ সাদা-কালো, সেজন্যই 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট'। তখন মহামেডানের জার্সিও ছিল সাদা-কালো। ক্লাবের আমিই ছিলাম সেক্রেটারি। ফুটবল কিনে ওই জমিতে খেলা শুরু হলো। আমি নিজেও ফুটবল খেলতেই বেশি পছন্দ করতাম। তবে ক্রিকেটও খেলেছি। ওখানে আমরা প্রচুর খেলেছি। পরে অবশ্য আমাদের ক্লাবটাই উঠে গেলো। কারণ, যার জমি ছিল, তিনি ভাবলেন জমিটা হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিলেন। ওখানে আমরা টেনিসও খেলতাম। ফুটবল খেলতে আমরা টিম নিয়ে ময়দানেও যেতাম, জেলাতেও যেতাম। তখন তো চারদিকে অসংখ্য ফুটবল টুর্নামেন্ট হতো। চার ফুট দশ, পাঁচ ফুট, বিভিন্ন হাইটের গ্রুপে প্রতিযোগিতা চলতো। আবার হাইট কমিয়ে ছোটো গ্রুপে ঢোকার জন্য অনেকে কোমরে বেলট বাঁধতো। ধরা পড়ে গেলে তা নিয়ে হই-চই চলতো।

ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার তো আমার পা-টাই গেলো ভেঙে। সেটা অবশ্য স্কুলের টুর্নামেন্ট ছিলো। আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্সের সঙ্গে আর্মেনিয়ান স্কুলের খেলা ছিল। তখন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ছিল আর্মেনিয়ান স্কুল; ওদের ওখানে রাগবি, ফুটবল, বিভিন্ন ধরনের খেলা হতো। পরে সাহেবদের এই স্কুলটা উঠে যায়। যাই হোক, সেদিন ওদের ছেলেরা সব বুট পায়ে খেলছিল। আমাদেরও কয়েকজনের পায়ে বুট ছিল। কিন্তু আমি খালি পায়েই খেলতাম। মাঠে আমার পজিশন ছিল রাইট উইং। তো, খেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দলের একটা ছেলে এমন জোরে আমার পায়ে মারলো যে পা-টাই গেলো ভেঙে! খেলতে গিয়ে শেষকালে ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরতে হলো। ব্যস! কিছুদিনের জন্য খেলা-ধুলা সব বন্ধ! তবে খেলাধূলার প্রতি আমার আকর্ষণ বরাবরই ছিল। বিলেতে যাওয়ার পরেও প্রথমদিকে ফুটবল, কাউন্টি ক্রিকেটও দেখেছি। ওখানে ইন্ডিয়া টিম খেলতে গেলে দেখতে যেতাম। উইম্বলডনে টেনিস খেলাও দেখেছি। পরের দিকে অবশ্য রাজনীতির প্রতি আগ্রহ এতো বেড়ে গেলো যে ওদিকটা কমে গেলো।

টের পেয়েছি!

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজী অনার্স নিয়ে মোটামুটি ভালোভাবেই বি এ পাস

করলাম। বাংলা নিয়ে আগে আশঙ্কা থাকলেও পরিশ্রমের ফল পেলাম। সেবছর ইংরাজিতে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। সেকেন্ড ক্লাসে ওপরের দিকেই আমার নম্বর ছিল। তখন তো মাথায় বিলেত যাওয়ার চিন্তা। বাবা বললেন, বিলেত যখন যাচ্ছো, আই সি এস-টাও একবার চেষ্টা করো। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারিতে ভর্তি হলাম। পরের বছর আই সি এস পরীক্ষায় বসলাম বটে, কিন্তু সফল হলাম না। ততদিনে তো রাজনীতির সংস্পর্শে এসে গেছি।

লন্ডনেই একটি বাড়িতে ভূপেশের সঙ্গে আলাপ। স্নেহাংশুও ওই সময় বিলেতে পড়তে এলো। মার্কসবাদী পাঠচক্রে দেখা হলো হ্যারি পলিট, রজনী পাম দত্ত, বেন ব্র্যাডলের মতো কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে। মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। সংগঠনে যুক্ত হয়ে গেলাম। বিলেতে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠিত করার কাজ আমরা করতাম। গড়ে উঠেছিল **লন্ডন মজলিস,** যার প্রথম সম্পাদক ছিলাম আমি। ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল কমিউনিস্ট গ্রুপ। সকলের নাম আমার এখন মনে নেই। তবে ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, পি এন হাক্সার, মোহন কুমার মঙ্গলম, রজনী প্যাটেল, এন কে কৃষ্ণান, নিখিল চক্রবর্তী, অরুণ বোস-এরা সব এতে ছিলেন বলে মনে পড়ছে। ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে মত গঠন ও অর্থসংগ্রহ করা ছিল আমাদের অন্যতম কাজ। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা লন্ডনে এলে তাদের আমরা সংবর্ধনা জানাতাম। জওহরলাল নেহরু, বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, ভূলাভাই দেশাই, সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রণী নেতাদের আমরা সংবর্ধনা দিয়েছিলাম।

আমার মনে আছে, সুভাষ চন্দ্র বসু বিলেতে এলে তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার পর আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। সুভাষ বসুকে জানালাম যে দেশে ফিরে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেই আমরা কয়েকজন কাজ করবো। সুভাষ বসু তাতে খুবই উৎসাহ দিলেন। তিনি এটাও বললেন, তবে মনে রেখো, Politics is not a bed of roses. এটা ঠিকই, সেটা পরে বেশ ভালোই টের পেয়েছি।

[গণশক্তি শারদ সংখ্যা - ২০০৮]

ফেলে আসা দিনের কিছু কথা

জ্যোতি বসু

আজ প্রায় ৬৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছি। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, একটা সময় ছিল যখন আমার চিন্তার জগতে রাজনীতির কোন স্থান ছিল না। তখন কমিউনিজমের নামও আমি শুনিনি। আমাদের পরিবার ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। পরিবারের সকলে চেয়েছিল আমি বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবো। এতে আমারও কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিলেত যাবার পরই আমার চিন্তার জগতে বিরাট পরিবর্তন আসে। কেবল লন্ডন নয়, তখন গোটা ইউরোপ জুড়ে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার বিরাট প্রভাব পড়ে আমার মনে। এই পরিবেশ-পরিস্থিতিই আমাকে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করে। আমি সেখানে অন্যান্যদের সাথে জড়িয়ে পড়ি নানা কর্মকাণ্ডের সাথে। অবশেষে আমরা কয়েকজন লন্ডনে থাকতে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিই যে, দেশে ফিরে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবেই কাজ করে যাব। আজও সাধ্যমতো সে কাজই করে চলেছি। সক্রিয় রাজনীতির সাথে আমার জড়িয়ে পড়া, কমিউনিজমের প্রতি আকর্ষণ বোধ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে নিজেকে কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলা— এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে অতীতের দিকে।

বিলেত যাওয়া

১৯৩৫ সালে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ অনার্স নিয়ে পাস করি। বাড়ির সকলের ইচ্ছা অনুযায়ী ঐ বছরের শেষে আমি ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যাই। আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি আই সি এস পরীক্ষাতেও বসি। পরের বছর সে পরীক্ষাও দিই। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। ব্যারিস্টারি পড়া চালাতে থাকি।

সে যাই হোক, আমি যখন লন্ডন যাই তখন গোটা ইউরোপ জুড়েই বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২২ সালে মুসোলিনি পার্টি গঠন করে ইতালির রাষ্ট্রমতা দখল করে। আমার লন্ডন যাবার এক বছর পর ইতালি আবিসিনিয়া দখল নেয়। গোটা জার্মানিতে

তখন চূড়ান্ত দুর্দশা চলছে। ভয়াবহ বেকারত্ব দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাসিস্ট হিটলার ক্ষমতায় আসে এবং চেকোস্লোভাকিয়া, পোলান্ড প্রভৃতি দেশ গ্রাস করে নেয়। তখন ব্রিটেনে আমরা দেখেছি, কনজারভেটিভ সরকারের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন চাইছিলেন কমিউনিজমের বিরোধিতার নামে হিটলারকে তোষণ করে চলতে। তিনি জার্মানিতে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে একটা চুক্তি করে এলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, "আমি পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি (I have brought back peace in the world)। আর যুদ্ধ হবে না।" তার এই কথার খুব প্রচার হলো ইংল্যান্ডে। সমস্ত সিনেমা হাউসগুলিতে লেখা হলো: "তাকে দেখুন, তার কথা শুনুন, তাকে প্রেরণা দিন।" (See him, hear him, cheer him)। তখন অসোয়াল্ড মোসলের নেতৃত্বে ছোট্ট একটা ফ্যাসিস্ট দল গড়ে ওঠে বিলেতে। মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা সেই দলের সদস্য ছিলেন। ওরা ফ্যাসিজমের খুব প্রচার করতো। বলতো, এখানেও ফ্যাসিজম দরকার ইত্যাদি।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার পাশাপাশি ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। জাপান আক্রমণ করেছে চীনকে। ঠিক তখনই স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফ্যাসিস্ট সেনানায়ক ফ্রাঙ্কোর বাহিনী নির্বাচিত রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা সকলেই রিপাবলিকান বাহিনীর পক্ষে দাঁড়ায়। এ বছর তো ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৬০ বছর পূর্তি হলো, ফলে নতুন করে আবার সে সব কথা মনে পড়ছে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি

আমার বিলেত যাবার আগে ৫/৬ বছর হীরেবাবু (মুখার্জী), সাজ্জাদ জাহির, ড. জেড এ আহমেদ আরও কয়েকজন ছিলেন যাঁরা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির (CPGB) সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং ওঁরাও আমাদের মতোই ঠিক করেছিলেন দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণে কর্মী হিসেবে কাজ করে যাবেন। ওরা চলে আসার পর কিছুদিন সি পি জি বি'র পক্ষ থেকে ভারতীয় ছাত্রদের সাথে আর যোগাযোগ ছিল না। ১৯৩৫ সালে আমি বিলেত যাবার পর দেখেছি অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ছাত্রদের সাথে ওরা যোগাযোগ করছে। তখন চারদিকে যুদ্ধ চলছে। মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করেছে, জাপান চীনকে আক্রমণ করেছে, স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, হিটলারের স্লোগান ছিল বেকার ছেলে মেয়েদের কাছে— "আজকে আমরা জার্মাতিতে শাসন করছি, আগামীদিনে আমরা বিশ্বকে শাসন করবো" (We are ruling Germany

today, tomorrow we shall rule the world)। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য হিটলার কিছু বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি দিতে লাগলো, জার্মানিতে কল-কারখানা, রাস্তাঘাট হতে লাগলো এরই পাশাপাশি কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ, মিথ্যা মামলা ইত্যাদি জোরালোভাবে চলতে লাগলো। সেখানকার কমিউনিস্ট নেতা ডিমিট্রভের বিরুদ্ধেও ওরা মিথ্যা মামলা করলো। কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণের সাথে সাথে ইহুদিদের বিরুদ্ধেও ওরা আক্রমণ শুরু করলো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত বড় বড় ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা, আইনস্টাইনের মতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের জার্মানি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হলো।

সি পি জি বি'র সাথে সংযোগ— লন্ডন মজলিশ-ইন্ডিয়া লিগ

দেশে থাকার সময় স্বাধীনতার কথা সেভাবে না ভাবলেও বিলেতে গিয়ে এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমারও মনে হলো, আমাদের দেশটারতো স্বাধীন হওয়া দরকার। যখন সি পি জি বি'র সাথে আমাদের যোগাযোগ হলো তখন দেখলাম ওরাও আমাদের সমর্থন করছে। সি পি জি বি'র নেতারা আমাদের বললেন, মুজফ্‌ফর আহমদের কাছ থেকে খবর এসেছে, আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো। আপনারা আলাদাভাবে কাজ করবেন। আমাদের সাথে খোলাখুলি মিশবেন না। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে বে-আইনি। আপনাদের ফিরে গিয়ে এই বে-আইনি পার্টিতেই কাজ করতে হবে। আমরা তাই ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে সেখানে একটা স্টুডেন্টস ফেডারেশন গড়ে তুলি। (ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশান — 'ফেড-ইন্ড')। এটা ছিল ইউরোপের সমগ্র ভারতীয় ছাত্র সংগঠনগুলির সমন্বয় করার সংগঠন। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে তৈরি করি 'লন্ডন মজলিস'। সেটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। আমি ছিলাম তার সাধারণ সম্পাদক।

এই সময়েই আমরা কৃষ্ণ মেননের ইন্ডিয়া লিগে যোগ দিই। উনি ব্যারিস্টার ছিলেন। ওখানে তিনি একটা অফিস নিয়েছিলেন। নেহরু তাঁকে সাহায্য করতেন। ইন্ডিয়া লিগের মাধ্যমে মেনন ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচার চালাতেন। আমাদের পেয়ে ওঁর খুব সুবিধা হয়ে গেলো। আমরা কয়েকজন রোজই প্রায় যেতাম সেখানে। আমাদের পাঠাতেন বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে। সবাই জানতে চাইতো ভারতবর্ষ সম্পর্কে। আমরা তখন বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বক্তৃতা দিতাম। এছাড়া আমরা সাইক্লোস্টাইল করতে শিখলাম। এভাবে কৃষ্ণ মেননকে সাহায্য করতাম।

ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য'র সাথে পরিচয়

এই সময়েই ভূপেশ গুপ্তের সাথে আমার পরিচয়। লন্ডনে আমি যে বাড়িতে থাকতাম কি করে খবর নিয়ে সেখানে একদিন চলে এলো। ও স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তো। দেশে থাকতেই ভূপেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশ ওকে ধরে বহরমপুর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ওর বাবাকে নলিনী রঞ্জন সরকার (তিনিও ময়মনসিংয়ের, হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স যিনি তৈরি করেছিলেন, আমরা যাঁর ভাড়াটিয়া ছিলাম কিছুদিন) তখন বললেন, আমি ভূপেশকে ছাড়িয়ে এনে দিতে পারি যদি তুমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দাও। নলিনী রঞ্জন সরকার বেশি লেখাপড়া করেন নি। কিন্তু ভাইসরয়, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ ছিল। ভূপেশকে তারপর ছেড়ে দেওয়া হলো। ও পাসপোর্ট নিল, কিন্তু তাতে লেখা থাকলো ইউ কে ছাড়া সে আর কোথাও যেতে পারবে না। এ রকম সাধারণত লেখা থাকে না। যাই হোক ভূপেশের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে আমার খুব ভাল লাগলো। আরও ইন্টারেস্ট লাগলো যে, সামনা-সামনি অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি দলের সাথে যুক্ত ছিল সে। ভূপেশের মাধ্যমেই স্নেহাংশু আচার্য'র সাথে আমার পরিচয়। বিলেতে থাকার সময়ে একবার ভূপেশের হার্নিয়া অপারেশন হলো। হাসপাতালে ওকে দেখতে গেছি। গিয়ে দেখি স্নেহাংশু বসে আছে। ভূপেশই পরিচয় করিয়ে দিল। বললো, ও মনমনসিংয়ের মহারাজার ছেলে। স্নেহাংশুর টেরোরিস্টদের সাথে যোগাযোগ ছিল। ওদের সাহায্য করতো। স্নেহাংশু দেশে থাকতেই একটু-আধটু রাজনীতি করেছে। পরে ও লন্ডন মজলিশে আসতো। বিভিন্ন সময়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হতো।

ইংল্যান্ডে তখন তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে। এদিকে আমারও মনে হলো যে, আমাদের দেশেরতো স্বাধীনতা দরকার। তখন একমাত্র পার্টি সি পি জি বি যারা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য খুব প্রচার করতো। লেবার পার্টিও মুখে বলতো, কিন্তু কাজে বিশেষ করতো না। যাই হোক, এসবে আমরা আকৃষ্ট হলাম। তারপর মার্কসবাদ সম্পর্কে জানতে লাগলাম এবং মার্কসবাদ অধ্যয়ন শুরু করলাম। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভাষণ শুনতে যেতাম তখন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, ভূপেশ গুপ্ত বহরমপুর জেলে থাকতেই ডিসটিংশন নিয়ে বি এ পাশ করেছিল। বিলেতে যাবার আগেই সে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিলেতে আমরা অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। মার্কসবাদ সম্পর্কেও কথাবার্তা হতো। তখন আমিও মার্কসবাদ চর্চা শুরু করে দিলাম। মার্কসবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টি তখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করছে, আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রচার করছে এবং অক্সফোর্ড, লন্ডন,

কেমব্রিজের ভারতীয় ছাত্রদের সংগঠিত করছে— এসব দেখে আমার খুব ভালো লাগতো। তখন আমিও আস্তে আস্তে এর সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিলাম।

ব্রিটিশ পার্টির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ

তারপর আমরা দেখা করলাম ব্রিটেনের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বেন ব্র্যাডলে, হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত প্রমুখের সাথে। 'সি পি জি বি' থেকে আমাদের গ্রুপের দায়িতে ছিলেন বেন ব্র্যাডলে। আমি ও ভূপেশ গুপ্ত ছাড়া ঐ গ্রুপে ছিলেন তারাপদ বোস ও একজন চেক মহিলা সহ অন্যান্যরা। আর একটা গ্রুপে ছিলেন এম কে কৃষ্ণাণ, মণি বিশ্বাস প্রমুখেরা। বেন ব্র্যাডলে ভারতে এসেছিলেন এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাহায্য করতে। উনি ট্রেড ইউনিয়নেরও বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি কি করে তাঁকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মামলায় বেশ কিছুদিন তাঁকে ভারতের কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।

এছাড়াও আর একজন নেতা ছিলেন মাইকেল ক্যারিট। তিনি ছিলেন আই সি এস অফিসার। গভর্নরের সেক্রেটারি হিসেবে কিছুদিন অবিভক্ত বাংলায় কাজ করেছিলেন। তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির লোক এবং আন্ডার গ্রাউন্ডে কাজ করেছিলেন সেটা প্রায় প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। হীরেন মুখার্জিরা তখন বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি হীরেন বাবুদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এ সবের ফলে তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে তাঁর চাকুরির সাত বছর হয়ে গেছে। পুরো পেনশনটা পেয়ে স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বিলেতে চলে যান। লন্ডনে আমাদের গ্রুপে তিনিও ছিলেন।

আমরা যখন শুনলাম যে, সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করা যাবে না, কারণ ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করেছে, তখন আমরা মার্কসবাদী পাঠচক্রে যেতে শুরু করলাম। সেখানে আমাদের পড়াতেন হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত, ক্লিমেন্স দত্ত, ব্র্যাডলের মতো নেতারা। আমরা লন্ডন মজলিশ, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ইত্যাদি সংগঠন তৈরি করে কাজ করতে লাগলাম। এছাড়া আমরা একটি ক্লাব তৈরি করি লন্ডনের ইস্ট এন্ডে— যা কিনা খুব গরিব এলাকা ছিল তখন, সেখানে আমর সাক্ষরতার কাজ করতাম। আসলে পূর্ববঙ্গের সিলেট, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ যারা মার্চেন্ট নেভিতে নাবিকের কাজ করতেন তাঁরা সেখানে ঐ বস্তির মতো অঞ্চলে থেকে যেতেন। জাহাজ থেকে চলে এসে তারা আর ফিরতেন না। অথচ তাঁরা ভালো করে

বাংলাও বলতে পারতেন না। সি পি জি বি আমাদের বললো, একটা ক্লাব তৈরি করে ওদের লেখাপড়াটা শেখাতে। ওরা যদি ইংরেজিতে লেখা রাস্তার নামগুলোও পড়তে পারে তাহলে চাকরি-বাকরির সুবিধা হবে। ওদের মধ্যে দু'চার জনকে দেখেছি মেমসাহেবও বিয়ে করেছে। অথচ ইংরেজি-টিংরেজি কিছুই জানে না। ওঁদেরকে আমরা পড়াতে লাগলাম। বিশেষ করে ইংরেজি অক্ষরগুলো বাক্যগঠন এবং ইংরেজিতে কথা বলা ইত্যাদি শেখাতাম। তাতে খুবই কাজ দিয়েছিল। ওরা চাকরি-টাকরি পেতো। পরের দিকে লেবার পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তখন ঠিক করেছিল, হয় ওদের চাকরি দেবে, নয়তো ভাতা দেবে। ওরা চাকবি-বাকরি করতো, দু-চার জন ভাতাও পেতো। যাহোক ওদের খুবই উপকার হয়েছিল।

ইন্ডিয়া লিগ-লন্ডন মজলিশের নানা কাজে

কৃষ্ণ মেননের সংস্থা 'ইন্ডিয়া লিগ'কে সি পি জি বি খুব সাহায্য করেছিল। সি পি জি বি একজন মহিলা কমরেডকে দিয়েছিল ইন্ডিয়া লিগের কাজে সাহায্য করার জন্য। এই মহিলা ইন্ডিয়া লিগের একটা ঘরেই থাকতেন এবং সর্বক্ষণ সাহায্য করতেন। ইন্ডিয়া লিগে আমরা কৃষ্ণ মেননকে টাইপ করে, সাইক্লো করে সাহায্য করতাম। সেই সময় সমস্ত ইংল্যান্ডেই ভারত সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ ছিল। বহু সংগঠন ইন্ডিয়া লিগের কাছে বক্তা চেয়ে পাঠাতো আমরা সেইসব সভায় গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বলতাম। আমাদের হাতে সাইক্লোস্টাইল করা কাগজে বক্তৃতার পয়েন্ট লেখা থাকতো। যেমন আমরা বলতাম, ব্রিটিশ শাসনে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়ায় কত লোক মারা গেছে, কতলোক বেকার হয়ে ঘুরছে—চাকরি-বাকরি কিছুই নেই, এইসব।

আমাদের লন্ডন মজলিশের কাজ ছিল বিভিন্ন হল ভাড়া নিয়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া। এছাড়া ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত গঠন করা, চাঁদা সংগ্রহও ছিল আমাদের কাজ। তারপর বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা ভারত থেকে ওখানে যেতেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া। এভাবেই আমরা জওহরলাল নেহরু, সুভাষ চন্দ্র বসু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের (সি এস পি) নেতা ইউসুফ মেহের আলি প্রমুখকে সংবর্ধনা দিয়েছি। আবার লেবার পার্টি যখন নেহরু, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখদের সংবর্ধনা দিয়েছে তখন আমরা ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করেছি। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে নানা যোগাযোগ এবং অনেকের সাথেই আলাপ হলো। লন্ডন, কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের কমিউনিস্ট গ্রুপ গঠিত হয়েছিল। এইসব গ্রুপের যাদের সঙ্গে তখন আলাপ হয়েছিল

তাঁদের মধ্যে ছিলেন, রজনী প্যাটেল, পি এন হাকসার, মোহন কুমারমঙ্গলম, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত , রেণু চক্রবর্তী, এন কে কৃষ্ণাণ, পার্বতী মঙ্গলম (পরে পার্বতী কৃষ্ণান), নিখিল চক্রবর্তী, অরুণ বসু প্রমুখ। আরও অনেকেই ছিলেন যাদের নাম এখন আর স্মরণে নেই।

তিনটি গোষ্ঠী মাঝে মধ্যে যুক্ত সভা করতো। তখন ইন্ডিয়া লিগের একজন নেতা ছিলেন ফিরোজ গান্ধী। লন্ডন মজলিশেও তাঁকে আমরা সক্রিয় সদস্য হিসেবে পেয়েছি। তিনি ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনে সভায়ও আসতেন। ভূপেশ গুপ্ততো ছিলেনই, স্নেহাংশু আচার্যও এই সমস্ত সভায় আসতেন। এই সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট হয়ে গেলাম। তখন লেখাপড়া একরকম ছেড়েই দিলাম। তবে তখন একটা সুবিধা ছিল ফার্স্ট পার্টে তিন-চারটে সাবজেক্ট ছিল, সেগুলি একটা একটা করে দেওয়া যায় এবং একটাতে ফেল করলে আবার তিন মাস পর পরীক্ষা হয়। কাজেই ফার্স্ট পার্টটা খুবই সহজ সেদিক থেকে। কিন্তু ব্যারিস্টার হতে গেলে তো সেকেন্ড পার্টটাতেও পাস করতে হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, নেহরু স্পেনে গেলেন রিপাবলিকানদে সাথে সাক্ষাৎ করতে। কৃষ্ণ মেনন এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখন স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলছে। স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বিখ্যাত নেত্রী ডলোরেস ইবারুরি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে এবং স্পেনের সাধারণতন্ত্রী (রিপাবলিকান) সরকারের পক্ষে সাহায্য ও জনমত সংগ্রহের জন্য ফ্রান্স সফরে আসেন। ডলোরেস ইবারুরির জন্য এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় প্যারিসে। কিন্তু ফরাসী সরকার যেহেতু ঐ যুদ্ধে অংশ নিতে চায়নি, তাই ঐ মহিলাকে বক্তৃতা দিতে দিল না। কারণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট ভূমিকা ছিল। সরকার থেকে বলা হলো, উনি সভায় উপস্থিত থেকে সংবর্ধনা নিতে পারবেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে পারবেন না। তাই তিনি সংবর্ধনা সভায় থাকলেন। অন্যদের বক্তৃতা শুনলেন, কিন্তু নিজে কিছু বললেন না। এই সংবর্ধনা সভায় জওহরলাল নেহরুসহ মোহিত ব্যানার্জি, ফিরোজ গান্ধী এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নেহরু এই সংবর্ধনা সভায় ডলোরেস ইবারুরিকে একটি লাল গোলাপের তোড়া উপহার দেন। এই ঘটনায় তখন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যা হোক নেহরুর এই ভূমিকা আমাদেরও খুব ভাল লাগে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

আমি প্রায় সাড়ে চার বছর বিলেতে ছিলাম। তারপর যুদ্ধ লেগে গেলো। তার আগেই হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে নেয়। স্ট্যালিন তখন চেষ্টা করছিলেন তার মিত্রদের সাথে থাকতে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যুদ্ধ হবেই। কিন্তু মিত্র স্টালিনের কথায় গুরুত্ব দিল না। তখন ফ্রান্সের সাথে সোভিয়েতের একটা চুক্তি ছিল যে, চেকোস্লোভাকিয়া আক্রান্ত হলে তা প্রতিহত করতে ফ্রান্স তাকে সাহায্য করবে এবং সোভিয়েতও সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু চুক্তিটা মানা হলো না। চেকোস্লোভাকিয়া আক্রান্ত হলো। রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে একটা অনাক্রমণ চুক্তি (non aggression pact) হয়েছিল। হিটলার পরে ওটাও মানলো না। সোভিয়েত তখন অনেক চেষ্টা করেছিল তার মিত্রদের বোঝাতে। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতও আক্রান্ত হলো।

যাই হোক, ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করলো। আমরা ভারতীয় ছাত্ররা পার্লামেন্টের সামনে গেলাম ব্রিটেন যুদ্ধ নিয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয় তা জানার জন্য। শুনলাম, ব্রিটিশ রাজশক্তি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। কিন্তু ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কারণ চেম্বারলেইন সরকার ধরেই নিয়েছিল, হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নকেই প্রথম আক্রমণ করবে, সোভিয়েত ইুনিয়ন ও জার্মানির মধ্যেই লড়াই হবে এবং ব্রিটেন অক্ষত থেকে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করলো। আমরা তখন নিরুপায়। আমাদের কাছে প্রথম থেকেই খবর ছিল, বোমা পড়বে এবং গ্যাস বোমার আক্রমণ হবে। ব্রিটেন যুদ্ধের জন্য তেমন প্রস্তুত না হলেও ওরা ভেবেছিল গ্যাস অ্যাটাক হবে। সেজন্য পুরুষ, নারী, শিশু সকলের জন্যই গ্যাস-মুখোশের ব্যবস্থা করেছিল। আমরাও যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্যাস মুখোশ পেয়ে গেলাম।

দেশে ফেরা

তখন মুশকিল হলো, আমার ফাইনাল পরীক্ষাটা দেওয়া হয়নি। কুমারমঙ্গলম তখন পরীক্ষা শেষ করে কেমব্রিজ থেকে ফিরে এলো। কিন্তু তখনো ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেয়নি। তারপর লন্ডনে থেকে খুব পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলো এবং ব্যারিস্টার হলো। ও আমাকে ফাইনাল পরীক্ষায় খুবই সাহায্য করেছিল। তার নোটগুলি আমায় দিয়ে বললো, 'তুমি তো বিশেষ পড়াশুনা করনি, বইপত্রও কেনোনি। এই নোটগুলি পড়ো। আমি খুব খেটে এই নোট তৈরি করেছি। এই নোটের বাইরে প্রশ্ন করবে না'। আমিও মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা

করে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা দিলাম এবং ফলাফলেরর জন্য অপেক্ষা না করেই ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে রওনা দিলাম। দেশে ফিরে আমি পাশের খবর পেলাম। আমরা কয়েকজন মিলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে জাহাজে করে ফিরে আসার পরই হিটলার ভূমধ্যসাগরে টর্পেডো ব্যবহার শুরু করে। আকাশ থেকে বোমা পড়তে শুরু করে। তখন ভূপেশ, ফিরোজ, ইন্দিরা (গান্ধী) আসতে পারেনি। ওরা লন্ডন থেকে অন্যত্র চলে যায় এবং ঘুর পথে দেশে ফেরে।

আমাদের এই যে যাবতীয় কার্যকলাপ সে সম্পর্কে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগ সবই খবর রাখতো। এটা টের পেলাম জাহাজে ফেরার সময়ে। যদিও কাকাবাবু খবর পাঠিয়েছিলেন খেলাখুলি কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম না করতে। আমরা সেমতো কাজ করলেও আমার একটা সন্দেহ আগাগোড়াই ছিল। জাহাজে আমার বাক্স তল্লাশি করা হলো। এমনটা যে হবে তা আঁচ করতেপেরে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' বইটি তখন সবে বেরিয়েছে, একজন মহিলা যাত্রীর কাছে সেটা গচ্ছিত রাখি। সেই মহিলা ছিলেন নিখিল চক্রবর্তীর মাসী। বিলেত থেকে 'এফ আর সি এস' পাশ করে ফিরছিলেন। সেই বইটি রক্ষা পেলেও গোয়েন্দারা আমার অনেকগুলি বই বাজেয়াপ্ত করলো।

দেশে ফিরে

বিলেতে থেকে আমি সোজা বম্বে এলাম। সেখানে দু'দিন থাকতে হয়েছিল। দেখা হলো পার্টি নেতা অজয় ঘোষের সঙ্গে। তখন পার্টি বে-আইনি। ছাত্র ফেডারেশনের মঞ্চ তখন ব্যবহার করা হতো। আমাকে বলা হলো, বম্বের কাছে 'আমলনেরে' নামক জায়গায় কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দের জনসভায় বক্তৃতা দিতে যেতে। আমার তখন খুব ভালো লেগেছিল। কারণ এতো বড় সভা বিলেতে তো দেখিনি, বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। আমি অবশ্য ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সভায় সেটি তর্জমা করে দেওয়া হয়েছিল। দু'দিন পর ট্রেনে কলকাতা ফিরে এলাম।

কলকাতায় এসে প্রথমেই আমি কাকাবাবু (কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ)-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বিলেতে থাকতেই তাঁর নাম শুনেছিলাম। এছাড়া পি সি যোশী, রণদিভের নামও শুনেছি তখন। আমি যখন কাকাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম তখন লক্ষ্য করলাম উনি আমাদের অনেক খবরই জানেন। সি পি জি বি'র সাথে নানা বিষয় নিয়ে তাঁর পত্রালাপ হতো। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাথেও যোগাযোগ ছিল তাঁর। কাকাবাবু সাক্ষাতের প্রথম

দিনই আমাকে বললেন, আজ থেকেই আপনি পার্টি সদস্য। আমি তাঁকে বললাম, আমি যে বিলেতে ৩/৪ বছর কাজ করলাম তার কি হবে? শুনে উনি একটু হেসে বললেন, তখনতো আপনি অ্যাপ্রেনটিস ছিলেন। যাইহোক, আমি ১৯৪০ সালে পার্টি সদস্য পদ পেলাম।

সেদিন কাকাবাবু আমায় বললেন, আমরা চাই আপনি বাইরে থেকে পার্টির কাজ করুন। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করুন। তাহলে পুলিশ সন্দেহ করবে না। আমার বিরাট সৌভাগ্য যে, তাঁর সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। একসঙ্গে কাজ করতে পেরেছি। তাঁর কাছ থেকে অনেক কথা জানতে পেরেছি। আর ডাঃ নারায়ণ রায় ছিলেন, যিনি কিছুদিন আন্দামান জেলে ছিলেন, তিনি খুব ভাল ডাক্তারও ছিলেন। পরে এম এল এ হয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতেও একটা যোগাযোগের জায়গা ছিল। যেখানে তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে যাঁরা ছিলেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হতো। তখন এমন কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড ডেনে যোগাযোগের জন্য আমাকে যেতে হতো। এভাবেই এখানে এসে পার্টির কাজ শুরু করেছিলাম। ঐ সময়ের একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে। হঠাৎ একদিন কাকাবাবু, সরোজ মুখার্জি এবং পাঁচুগোপাল ভাদুড়ি রাত প্রায় দশটার সময় আমার হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, "আমরা ডিটেকটেড হয়ে গেছি। কালই সকালে রেইড করবে, লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি আমাদের একটা থাকার ব্যবস্থা করুন।" তখন আমার একটা গাড়ি ছিল। ড্রাইভার ছিল না। আমিই ড্রাইভ করতাম। আমি ভাবছি এতো রাতে কোথায় নিয়ে যাব। তখন একজনের কথা মনে পড়লো— গোপাল কুমারমঙ্গলম। মোহন কুমারমঙ্গলমের দাদা। সেও কেমব্রিজে পড়তো। সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। কিন্তু কমিউনিস্ট বলতো নিজেকে। কলকাতায় কাজ করতো। আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা করতো। তখনও বিয়ে থা করেনি। সে ডোভার লেনে একা থাকতো একটা বাড়িতে। আমি সেখানে ওদের নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। ঘরের সব জানালা খোলা, কোনও লোকজন নেই। ওর বেড রুমে গিয়ে দেখি ও মশারি টাঙিয়ে ঘুমিয়ে আছে। সেদিন বোধ হয় শনিবার ছিল। বোধহয় লেক ক্লাবে গিয়ে খুব মদ-টদ খেয়েছে। তা আমি তাঁকে বললাম, Gopal, I have brought some friends for you. They are going to stay here tonight. Tomorrow I will come. Please look after them. ও কিছুই বুঝলো না। শুয়ে শুয়েই বললো, Yes, Yes, it is all right, Let them stay here. তারপর ওরা চেয়ার-টেয়ার টেনে বসে কেনোরকমে রাতটা কাটিয়ে দিল। সকালে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। কাকাবাবুরা সেখানে তিন দিন ছিলেন। সেই সময় আমার উপর পুলিশের অতোটা সন্দেহ ছিল না। তাই এসব কাজ করতে পেরেছি। বিশ্বনাথ মুখার্জিও আমার বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন কিছুদিন। আন্ডারগ্রাউন্ড মিটিং-ও আমার বাড়িতে দু'একটাও হয়েছে।

আমার বাবা-মা আমার এসব কাজ, পার্টির হোলটাইমার হওয়া ইত্যাদি খুব একটা পছন্দ করেন নি। কিন্তু পার্টি নেতাদের যখন বাড়িতে আশ্রয় দিতাম তখন আপত্তি করতেন না। আন্ডারগ্রাউন্ডের কমরেডদের অন্য নামে বাড়ি ঠিক করে দিতাম— যেখানে ওরা আন্ডারগ্রাউন্ড থাকতেন। তাঁদের ক্যুরিয়র-টুরিয়র ছিল যোগাযোগ রাখবার জন্য। বিলেত থেকে ফিরে প্রথম দু'বছর ছাত্র ফেডারেশনের প্ল্যাটফর্মে বক্তৃতা দিতাম, মার্কসবাদ বিষয়ে ক্লাস নিতাম। প্রথমে দু'বছর এভাবে চলার পর পার্টি থেকে আমাকে পোর্ট অ্যান্ড ডকে কাজ করতে বলা হলো। ওখানে তখন সংগঠন সেরকম ছিল না। আমি সেখানে গিয়ে একটা অফিস ভাড়া নিলাম। কিন্তু সেই আফিসে কেউ আসতো না। তখন সোমানাথ লাহিড়ী আমায় বললেন, "এই দোকান খুলেই থাকতে হবে। কে আর আসবে?" তখন সরোজ মুখার্জি আমায় উপদেশ দিলেন, "আপনি শিয়ালদহতে রেলওয়ে ইউনিয়ন করুন। বি এন রেলওয়ে।" ফরচুনেটলি সেটা খুব তাড়াতাড়ি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠলো। আমরা ৩/৪ জন সেখানে কাজ করতাম। ১৯৪৬ সালে সুরাবর্দির আমলে যখন নির্বাচন হলো আমি ইউনিয়ন থেকে প্রার্থী হিসবে ট্রেড ইউনিয়ন কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে নির্বাচিত হলাম। আমার সাথে একই সময়ে নির্বাচিত হলেন দার্জিলিঙের রতন লাল ব্রাহ্মণ এবং দিনাজপুরের রূপনারায়ণ রায়।

এর আগে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন যখন হিটলারের নাৎসি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তখন আমরা অনেকে মিলে 'ফ্রেন্ডস্ অফ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন' গঠন করি। আমি এই সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। তাতে হীরেন মুখার্জি, কবি বিষ্ণু দে, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিশিষ্টরা ছিলেন। স্নেহাংশু আচার্যও এটা গড়ার পিছনে ছিল। তারপর প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন হলো। এভাবে নানা কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই আমার রাজনৈতিক জীবন চলতে লাগলো। একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সাথে আমার সংযোগ ঘটলো, অন্যদিকে বৃহৎ গণআন্দোলনের, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুবিস্তৃত পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এভাবেই চলতে চলতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই আমার রাজনৈতিক জীবন, কমিউনিস্ট জীবন গড়ে উঠতে লাগলো। আমার রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় দেশের স্বাধীনতার প্রত্যাশার পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের যে আশা মনে জেগেছিল সেই আশা নিয়েই দেশের গরিব সাধারণ মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবার অঙ্গীকার করছিলাম। আমাদের পার্টির নেতৃত্বে আজীবন সে কাজ করতে সচেষ্ট থেকেছি।

আমি চাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে কাজই করে যেতে।

দেশহিতৈষী শারদ সংখ্যা-২০০৫

ভারতীয় গণতন্ত্র ও বামপন্থীদের অভিজ্ঞতা

জ্যোতি বসু

লোকসভার প্রথম স্পিকার শ্রী মবলঙ্করের নামাঙ্কিত বক্তৃতামালায় 'ভারতীয় গণতন্ত্র বামপন্থীদের অভিজ্ঞতা'-র ওপর বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি সম্মানিতবোধ করছি। শ্রী মবলঙ্করের নেতৃত্বে এমন সমস্ত স্বাস্থ্যকর রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ-নির্মাণে আমাদের সাহায্য করেছে। গোড়ার সেই দিনগুলিতে আমাদের গণতন্ত্রকে একটা সঠিক আদল দেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এমন বলতে পারি না যে, আমি সমস্ত বামপন্থীদের হয়ে ভাষণ দিচ্ছি। কারণ স্বাধীনোত্তরকালে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে কাজকর্মের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বামপন্থী শরিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য বহুলাংশেই ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টি ভাগ হয়ে যাবার পর ১৯৬৪ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র মতামত তুলে ধরবে।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলায় মুসলিম লিগের শাসনকালে আরও দুই সহকর্মীর সাথে আমিও বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমরা বিরোধীদল হিসাবে বিধানসভায় আসন গ্রহণ করেছিলাম এবং আইনসভায় অংশগ্রহণ ও পাশাপাশি তার বাইরে জনগণের মধ্যে থেকে কাজ করে যাওয়া সংক্রান্ত আমাদের যে সুপরিচিত নীতি তা রূপায়িত করেছিলাম। এখনও পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত আইনসভায় বিরোধী দল হিসাবে অবস্থান করি, সেখানে আমরা পরিচালিত হই একই দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির দ্বারা। সেই কালপর্বে আমি অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম যা পরবর্তীকালে আমকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে। স্বাধীনতালাভের পর, ভারত ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের সংসদীয় গণতন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আমাদের পার্টি সিদ্ধান্ত নিলো, আইনসভাগুলিতে অংশগ্রহণের সাথে সাথে আইনসভার বাইরে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের কথা বলতে গেলে, বিগত বছরগুলিতে ইতিবাচক ও

নেতিবাচক নানাবিধ অভিজ্ঞতাই আমরা অর্জন করেছি। স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাংলা ও ভারতের আরও কিছু জায়গায় আমাদের পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলো। তখন আমি বিধানসভার সদস্য, তবুও অনেকের সঙ্গে আমাকেও স্বাধীন দেশে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিলো।

সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর, কলকতা হাইকোর্টের রায়ে আমাদের পার্টি আইনী স্বীকৃতি অর্জন করে এবং আমাদের বেশ কয়েকজন মুক্তি পায়; যদিও বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়েছিলো। স্বাধীন ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর পাশাপাশি আমি ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলাম। বহু বছর ছিলাম বিরোধী দলনেতা। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-৭০ সালে — দু'বার উপমুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭৭ সাল থেকে টানা সাড়ে তেইশ বছর আমি বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বপদে আসীন ছিলাম। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটি এক রেকর্ড সৃষ্টিকারী ঘটনা। ধারাবাহিকভাবে ষষ্ঠবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হয় আগের বারের মতোই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। ২৫ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারে রয়েছে। রাজ্যগুলির সীমিত ক্ষমতা, বেশিরভাগ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছুসংখ্যক বৃহৎ সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে অসত্য ও অর্ধসত্যকে ভিত্তি করে আমাদের পার্টি ও সরকারকে কলঙ্কিত করার চেষ্টার প্রেক্ষিতে এই সাফল্য আদৌ ছোটো-খাটো বিষয় নয়।

শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য, স্বাধীনতালাভের পরবর্তী দীর্ঘ সময়কাল ধরে আমাদের পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের সঙ্গে আমাকে বহুবার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ এবং বিভিন্ন অভিযোগে আরও অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমাদের কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তা অবহিত করতে উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবাংলার কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা একটি নতুন পার্টি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দল নির্বাচনে পরাজিত হয় এবং অন্যান্য পার্টির সঙ্গে মিলে আমাদের পার্টি এক ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন

করে। সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, গরিষ্ঠসংখ্যক বিধায়ক আমাদের পার্টির হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের পার্টি পূর্বতন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মেনে নেয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থবাহী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, প্রাক্তন কংগ্রেসীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা নয় মাসের মধ্যে সরকারকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলো। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় তা সত্ত্বেও সরকার বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন। একারণে তিনি সরকারের টিকে থাকার অধিকার আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকার দিন স্থির করেন। কিন্তু, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে রাজ্যপাল আমাদের নির্দিষ্ট করা তারিখের আগেই বিধানসভা অধিবেশন ডাকার নির্দেশ দেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাতে অসম্মত হই। এই কারণে তিনি আমাদের সরকার বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেন। সৌভাগ্যের বিষয় হলো, রাজ্যপালের অগণতান্ত্রিক কাজের জন্য জনগণের মধ্যে পুঞ্জিভূত উষ্মা ও বিরক্তি ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ব্যাপকভাবে জিততে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু সরকারে আসীন হওয়ার তেরো মাস পর আমরা শরিকী বিবাদে জড়িয়ে পড়ি, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সরকার ভেঙে যায়। রাজ্যপালের পক্ষ থেকে এক সংখ্যালঘু সরকারকে মদত দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতির শাসন রুজু হয়।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন দেওয়ার পটভূমিতে ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই বিষয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলো আমাদের পার্টি। আমাদের পার্টি নির্বাচনে গরিষ্ঠতম দল হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল আমাদের পার্টিকে সরকার গঠন করতে ও বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা করতে দিতে অসম্মত হন। বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকেই সরকার গড়তে দেন। কিন্তু সেই সরকারের স্থায়িত্ব ছিলো তিন মাস। এরপর জারি করা হয় রাষ্ট্রপতির শাসন।

১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর জঘন্য ধরনের আঘাত হানা হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চক্রান্ত করে, ব্যাপকভাবে কারচুপি ও সন্ত্রাস চালানোর ফলে এ নির্বাচন পরিণত হয় প্রহসনে। ১৯৭১ সালের মতো এবারেও পথে টহল দেওয়ার জন্য সেনা তলব করা হয়। জনগণের কাছে এটা ছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব অভিজ্ঞতা এবং আমাদের দলগত সংখ্যা ১১১ থেকে নেমে দাঁড়ায় ১৪ জনে। সকাল

থেকেই আতঙ্কের সৃষ্টি ও মানুষ ভোট দিতে না পারার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। আমি বেলা এগারোটা নাগাদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াই। আমাদের আশঙ্কামতো বহুসংখ্যক নির্বাচন ক্ষেত্রে একই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিলো। আমাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে অক্ষমতার কথা জানায় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের পূর্বে যখন আমরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম বিষয়টি নিয়ে সে সময় তিনি আমাদের এবং বিধি-আশঙ্কাকে খারিজ করে দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের নির্বাচনোত্তরকালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি এমনভাবে পর্যদুস্ত করা হয়েছিলো যার ফলে আমাদের হাজার হাজার সমর্থক ও পার্টি সদস্যকে আটক ও আমাদের পার্টির ১১০০ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিলো। কিন্তু দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমরা পাঁচ বছর ধরে বিধানসভা বয়কট করার দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং আরও বেশি করে জনসাধারণের কাছে যাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ - এই কালপর্বে পশ্চিমবঙ্গ সম্মুখীন হলো এমন এক পরিস্থিতির যাকে আমরা অভিহিত করেছিলাম আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস বলে। এই সন্ত্রাস অধিকতর মাত্রা পেয়েছিলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থায় যখন জীবনের অধিকারসহ সব ধরনের স্বাধীনতার বিলোপ সাধন ঘটানো হয়। তবে আমরা কখনই হার স্বীকার করিনি জনগণের শত্রুদের কাছে। আমরা মানুষের ওপর বিশ্বাসে অটুট ছিলাম। ১৯৭৭ সালে যখন জরুরি অবস্থার অবসান ঘটলো, জনগণ কেন্দ্রের এবং পশ্চিমবঙ্গসহ বহু রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসকবর্গকে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন।

যাই হোক, পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যাঁরা গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিলেন তাঁরাই আবার জনগণের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সচেতনতার অভাবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে এলেন। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে যা প্রয়োজন, বেশিরভাগ রাজ্যে সেই নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম আমরা অর্থাৎ বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি।

এবার আমি বলতে চাইছি, কেরালাকে ঘিরে আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে, যেখানে ১৯৫৭ সালে প্রথম কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিলো। বিধানসভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন। তারপর থেকে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের আশঙ্কার কারণ আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমরা আশা ছেড়ে না দিয়ে এই চরম অবিচারের

বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করতে গণ-বিক্ষোভের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলাম। ১৯৬৪ সালে ভারত সরকারের আদেশবলে আমি এবং ই এম এস বাদে তামিলনাড়ুর ত্রিচিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় উপস্থিত সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যকে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়। রাজ্যজুড়ে ব্যাপক মাত্রায় গ্রেপ্তার চালানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা কলঙ্ক রটানো হয়। কেরালায় ১৯৬৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের জয়কে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছিলো এক মরিয়া চেষ্টা। গণতন্ত্র রক্ষা নিয়ে তেমন কোনো উদ্বেগ ছিলো না কেন্দ্রের শাসককুলের। এইরকম পরিস্থিতিতেও, নির্বাচিত বিধায়কদের সর্বাধিক সংখ্যা ছিলো আমাদের পার্টির, এঁদের মধ্যে কয়েকজন জেল থেকেই নির্বাচিত হন; আমাদের পার্টি বিধানসভায় গরিষ্ঠতম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ছিলো গণতন্ত্রের প্রতি কেরালার মানুষদের এক তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। কিন্তু সরকার গঠিত হতে না পারার কারণে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয় এবং জারি করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। ১৯৬৭ সালে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেস পার্টিকে পরাজিত করে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার।

উত্তর-পূব ভারতের চোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের প্রবেশের ফলে সেখানকার উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন; গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। যাই হোক, প্রধানত বাঙালীভিত্তিক কংগ্রেস পার্টি উদ্ধত মনোভাব গ্রহণ করে এবং হরণ করে সংখ্যালঘুদের অধিকার, যার ফলে বড় ধরনের বিভাজন ঘটে যায়। আরও কিছু বামপন্থী পার্টির সঙ্গে মিলে আমাদের পার্টি দুই অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। উভয় গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় নজর দেয়। কংগ্রেস পার্টি ও কেন্দ্রে অবস্থানকারী ওই পার্টির সরকার গণতন্ত্রের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাশীল না হয়ে উপজাতিদের সশস্ত্র এক অংশকে উসকানি দিতে থাকে এবং তাদের ব্যবহার করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। একবার নির্বাচনের প্রাক্কালে, যখন বাঙালীদের নিধন যজ্ঞ ঘটে যায়, সে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলায় পুলিশ নামায় এইকথা বোঝাতে যে, কেবলমাত্র কংগ্রেস সরকারই পারে ত্রিপুরাকে বাঁচাতে। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের লেখা এক চিঠির বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছিলো যে, যদি উপজাতিদের অধিকতর অংশের প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্টদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা প্রতিশ্রুতি দেবে কংগ্রেসকে সাহায্য করার। কিছু সময়ের

জন্য পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিলো এবং পরাজিত হয়েছিলাম আমরা। কিন্তু পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল এবং এর কর্মসূচীমাফিক উপজাতি - প্রধান এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করে আমরা আমাদের অবস্থানের পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হই এবং সমর্থ হই বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জঙ্গি কার্যকলাপ রয়ে গেছে এবং কংগ্রেস পার্টি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন অস্ত্রধারী উপজাতিদের আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে, যে সরকার আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন করে চলেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কিত আমাদের অভিজ্ঞতাই হলো আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। নিজেদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে জনগণের ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনগুলি কেন্দ্রীয় ও কিছু রাজ্য সরকার কীভাবে দমনমূলক পদ্ধতিতে ও দানবীয় আইন প্রয়োগ করে অবদমন করার চেষ্টা করেছিলো — সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলিকে বাধা দিতে কী কী চেষ্টা চালানো হয়েছিলো সেই অভিজ্ঞতায় খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখানে আছে বলে মনে করছি না। যতদূর স্মরণে আসছে, তাতে যে সমস্ত রাজ্য এই বিষয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে সেগুলি হলো অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার এবং জম্মু ও কাশ্মীর।

এই সুযোগে আমি আপনাদের বলতে চাইছি কীভাবে আমরা কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং এদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের নীতিগুলি সাযুজ্যপূর্ণ করে তুলেছি। স্বাধীনতালাভের শুরুর কাল থেকেই আমরা সন্দিহান ছিলাম কেন্দ্রে তো বটেই রাজ্যগুলিতেও বামপন্থী শক্তি ও পার্টিগুলির সরকার গঠনের অধিকার থাকবে কিনা। কিন্তু ১৯৫৭ সালে কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট পরিচালিত সরকার গঠনের পর, গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বামপন্থী পার্টিগুলির দ্বারা রাজ্য সরকার গঠনের সম্ভাবনা আমাদের পার্টি-কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তবে সেসময় কেন্দ্রে প্রথম সরকার গঠন ছিলো আমাদের চিন্তাভাবনার বাইরে। পরবর্তীতে এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যখন আমরা বাইরে থেকে তিনবার কেন্দ্রে অ-কংগ্রেস সরকারগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। আর একবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে, যখন বি জে পি-র বিপদ মূর্ত হয়ে উঠলো, যে সরকার কিছু সময়ের জন্য, এমনকি, কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করেছিলো। পরবর্তীকালে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কংগ্রেস সেই সমর্থন তুলে নেয় এবং সুবিধা করে দেয়

বি জে পি- কে। বাস্তবতা বিবেচনায় আমাদের পার্টির কর্মসূচীকে সময়োপযোগী করতে গিয়ে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছি যে, কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমাদের পার্টি কেন্দ্রের সরকারে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করবে। দেশ ও দেশের মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হবার প্রসঙ্গ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্য এক রণকৌশলগত প্রশ্ন। বাস্তবে এক অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বামপন্থী ও কয়েকটি গণতান্ত্রিক পার্টিকে নিয়ে উদ্ভব ঘটেছে তৃতীয় ফ্রন্টের। কিন্তু একে শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে এটি এক যথার্থ বিকল্প হিসাবে দেখানো যেতে পারে।

আমরা কর্মসূচীতে পুনরায় ব্যক্ত করেছি যে আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো জনগণতন্ত্র, যা শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের দিকে অর্থাৎ শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থায়। সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন হলো আমাদের সংবিধান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের আওতায় থাকা সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করে শ্রেণী শক্তিগুলির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানো। আমাদের সংবিধানে যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাসহ সংবিধান বর্ণিত বুনিয়াদি উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলি রক্ষায় সদাজাগ্রত থাকার জন্য আমরা আহ্বান জানিয়েছি জনসাধারণকে। সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। আমরা কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবনা করে চলেছি যেগুলি কার্যকর হলে জনসাধারণের অধিকারের পরিধি বিস্তৃত হবে এবং রাজ্যগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা অর্পিত হলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পরিবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হবে ভারতীয় ঐক্য। ৩৫৬ ধারা ও জরুরি অবস্থা জারি করার মতো নেতিবাচক ব্যবস্থাগুলি খারিজ করা বা পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। উদাহরণ হিসাবে এগুলি উল্লেখ করা হলো, এ কোনো বিশদ আলোচনা নয়।

আমরা বিশ্বাস করি, যে মানুষই ইতিহাস রচনা করেন। তাঁদের ওপর আমাদের দৃঢ় আস্থা। তাঁরা কখনো কখনো ভুল করলেও শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ বেছে নেবেন। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম আন্দোলনের পাশাপাশি, আমাদের অভিমত হলো, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, অগণতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদপন্থী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম জরুরি।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমরা বিশ্বাস রাখি, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের বিরাট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা

ও দাবি-দাওয়ার দিকে দৃষ্টি রেখে এতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

আমাদের পার্টির সময়োপযোগী কর্মসূচীতে আমরা আবার পরে বলেছি যে, শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো বিপদাশঙ্কা আসে না। তা আসে শোষকশ্রেণী ও যে পার্টিগুলি তাঁদের স্বার্থরক্ষা করে সেগুলির থেকে। আমরা একথাও বলি যে, জনগণের স্বার্থে এই সব বিপদের বিরোধিতা করে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা ও সংসদের বাইরের কাজকর্মকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন যেগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রাণবস্তুকে ক্ষয়প্রাপ্ত করছে সেসব বিষয়ে আমি কিছু বলিনি কারণ এটি অন্যবিধ বিষয়। কিন্তু আমি মনে করি যে সঠিক মনোভাবাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে থাকেন। নানাবিধ টানাপড়েন সত্ত্বেও গণতন্ত্র, তাতে যতই অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, টিকে আছে — এটাই সন্তুষ্টির বিষয়। কংগ্রেস রাজত্বকালে নির্বাচনী সংস্কার আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হলেও তাকে হিমঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে। পার্লামেন্টে বিষয়টি আনা ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ মতামত।

আমার মনে হয় যে, আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা হাজির করা প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে। কেননা রাজ্যে ও কেন্দ্রে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। সেরকম একটি সরকার গঠিত হলে আমাদের পার্টি তাতে অংশগ্রহণ বা তাকে বাইরে থেকে সমর্থন দেবার কথা বিবেচনা করবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা যেমন এক অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী রূপায়ণে সহযোগিতা দেব, পাশাপাশি আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার কথাও বলব। যখন আমরা কেন্দ্রের বা রাজ্যগুলির সরকারকে সমর্থন জানাই না সেসময় আমাদের পার্টি জনগণের স্বার্থে কাজ করে থাকে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসাবে।

আগে যা বলেছি, অর্থাৎ, সংসদের বাইরের কাজকর্মসহ সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণের চেতনা উন্নত করার চেষ্টা করি, যাতে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তনের এবং জনগণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, এক

শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

পরিশেষে, যে বিষয়ের ওপর আমি বক্তব্য রাখছি তার সঙ্গে সম্পর্কিত আর কিছু ভাবনা উপস্থিত করতে চাইছি।

১৯৪০ সালে লন্ডন থেকে ফিরে এসে যখন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করি সেই সময় থেকে ৬৪ বৎসর ধরে রাজনীতিতে থেকে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও আমি খুশি কারণ জনগণ প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জারি রাখতে বারে বারে এগিয়ে এসেছেন, যদিও এর ধারাবাহিকতায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে। আমি বিশেষত উদ্বিগ্ন বোধ করছি, সেই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার যেখানে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে নস্যাৎ করতে চাইছে, আমাদের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ও তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেসব শক্তি এখন কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছে, তারা বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ-র নির্দেশ অন্ধভাবে মেনে নিয়ে দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল এবং প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের দেশকে বিদেশি রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল করে তুলছে। আজ আমাদের দেশের জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিকে বিদায় জানানো হচ্ছে, যার ফলে ভারত তার নিজস্ব সত্তা হারাচ্ছে। এসব সত্ত্বেও আমার নিশ্চিত ধারণা হলো এমন সর্বনাশা পরিস্থিতি সাময়িক প্রকৃতির।

যে কংগ্রেস দল তার নানাবিধ নীতির জন্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, অথচ এখনও সংসদে সবচেয়ে বড়ো বিরোধী দল এবং এখনও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ করে চলেছে, সেই দলটি তবুও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার ভুল নীতির কারণে দেশে ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও আত্মসমালোচনার পথে গেল না — তা দেখে আমি বিস্মিত।

খেদের বিষয়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলায় বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এগিয়ে এলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাদের শক্তি কম। তবে উপযুক্ত বিকল্প গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। আনন্দের কথা, জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ এখন গণ-আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে উপযুক্ত অভিমুখ ও সঠিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত তাঁদের সামনে তুলে ধরা।

গুজরাটের ঘটনাবলীর ওপর দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিদলের বক্তব্য এবং পার্লামেন্টের উভয় সভায় বিতর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির ভিত্তিতে আমার কিছু মন্তব্য করার বিষয় রয়েছে। আমি দুঃখিত, লজ্জিত ও ক্ষুব্ধও; কিন্তু বিমূঢ় নই অন্ধকারের এই শক্তিগুলিতে। গোধরায় করসেবকদের ওপর কিছু সংখ্যক অপরাধী ব্যক্তির নারকীয় আক্রমণের পরবর্তীকালে, রাজ্য বি জে পি সরকারের মদতে এবং বি জে পি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের মৌনসম্মতিতে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর যে বর্বর অভিযান চালানো হয় সেই নৃশংসতার বিরুদ্ধে ঐকমত্য গড়ে ওঠার ঘটনা অবশ্যই আশাপ্রদ। গণতন্ত্র ও সভ্যতার জয় হবে নিশ্চয়।

(২০০২ সালের ১৮ই মে নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে সপ্তম জি ভি মবলঙ্কর স্মারক বক্তৃতা-সভা আয়োজন করে দ্য ইনস্টিটিউট অব কনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড পার্লামেন্টারি স্টাডিজ। ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার রবি রায় ও শিবরাজ পাতিল, বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রামনিবাস মির্ধা, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস এ বি ওয়াধেয়া ভাষণ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ, বিভিন্ন গণ-সংগঠনেরর নেতৃত্ব, মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী ও আরও অনেকে।)

স্বাধীনতার ৬০ বছর ও বামপন্থীরা : কিছু ভাবনা

জ্যোতি বসু

ব্রিটিশ ওপনিবেশিক পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতের স্বাধীনতার ৬০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে। বিশেষ করে আমাদের মতো সেইসব মানুষের কাছে যারা এই মহান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর্বে জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং বিদেশী শাসনের অবসানের পর একটি সমতাপূর্ণ, ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে এই মহান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই উপমহাদেশে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন দিকগুলির পুনরায় স্মারণ করার এবং অতিবাহিত বছরগুলিতে আমরা কী সাফল্য অর্জন করেছি তার মূল্যায়ন করার সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে নিজস্ব রীতিতে উদ্‌যাপিত এই স্বাধীনতা উৎসব।

কংগ্রেসের জন্ম

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের ১৫০তম বৎসরকেও চিহ্নিত করছে ২০০৭ সাল। কার্ল মার্কস সঠিকভাবে এই বিদ্রোহের চরিত্রায়ণ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধরূপে। যদিও প্রাক্ ১৮৮৫ পর্যায়ে ব্রিটিশ নিপীড়নের বিরুদ্ধে উপজাতি বিদ্রোহ ও কৃষক বিদ্রোহগুলির মতো গণ-অভ্যুত্থান জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ভূমিকা পালন করেছিলো, তথাপি বুর্জোয়া নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় ব্যাপকভিত্তিক মঞ্চরূপে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্যই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে এক সংগঠিত অখিল ভারতীয় আকৃতি প্রদান করে। আমাদের মতো দেশে— জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রধান প্রবাহটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো। লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ শাসনের জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক সমালোচনার প্রেক্ষাপটেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। দাদাভাই নওরোজীর মতো দৃঢ়চেতা জাতীয়তাবাদী ঔপনিবেশিক ভারত থেকে সম্পদ চালানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

ভারতব্যাপী সংগঠিত গণ-প্রতিরোধ ধাপে ধাপে শক্তিশালী হয়ে ওঠার ফলে

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিলো। গত শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলন সারা দেশে সংগঠিত গণ-প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সূচিত করেছিলো। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি ছিলো আরেকটি পরিবর্তনের দিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। অবশ্য ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশ স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো পরিণত ও সংহত করেছিলো। জনগণের সমস্ত অংশের, যেমন ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিকদের রাজনৈতিকীকরণে গান্ধীজীর অবদান ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধে তাঁর আস্থা আন্দোলনকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলো। রাওলাট সত্যাগ্রহ ছিলো তাঁর ব্রিটিশ রাজ্যের মুখোমুখি হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু গান্ধীজীর গভীর প্রভাব সত্ত্বেও শ্রেণী রাজনীতির বিরোধিতা ছিলো গান্ধী-জাতীয়তাবাদের প্রধান নেতিবাচক বৈশিষ্ট। তাঁর অহিংসা সম্পর্কিত ধারণার মূল ভিত্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সচেতনতাকে নস্যাৎ করে। এটাও ঘটনাযে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রামসহ জঙ্গী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মিলিত রূপ ছিলো। এইসব সংগ্রামের মিলিত আঘাতেই বিপুল শক্তিধর ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রমশ ক্ষয় হয়েছিলো।

কমিউনিস্টদের ভূমিকা

অবিরাম দমনপীড়ন সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শ্রমজীবী জনগণকে সংগঠিত করার জন্য তাঁরা চরম আত্মত্যাগ করেছিলেন। দেশের বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। বিদেশে কর্মরত বিপ্লবী দেশপ্রেমিকরা, যার মধ্যে ছিলেন খিলাফত ও হিজরাত আন্দোলনের বিপ্লবীরাও, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও শেষে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং গদর পার্টির কর্মীরা— কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২০ সালের প্রথমার্ধে দেশের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো। শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমশ বৃদ্ধির সাথে কমিউনিস্ট আন্দোলন বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবও কাজ করেছিলো। নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের আশা সঞ্চার করেছিলো এই বিপ্লব। সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণকে বিপুল প্রেরনা দিয়েছিলো এই মহান অক্টোবর বিপ্লব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকে দুর্বল করতে এই বিপ্লবের অবদান অসীম। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিনটার্ণ) সংগ্রামরত ভারতীয় জনগণের সমর্থনে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে ধিক্কার জানিয়েছিলো এবং আমাদের আত্মত্যাগে অংশ নিতে এগিয়ে এসেছিলো। রজনীপাম দত্ত (RPD), ক্লীমেন্‌স দত্ত, ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেন ব্র্যাডলের মতো কমিউনিস্টদের অবদান আমাদের স্মরণ করা উচিত। মিরাট 'ষড়যন্ত্র' মামলায় স্প্র্যাট ও ব্র্যাডলে অভিযুক্ত হয়ে হাজতে বাসও করেছিলেন।

ব্রিটেনে অধ্যয়নরত ছাত্রসহ ভারতীয়দের সংগঠিত করার কাজে ব্রিটিশ কমিউনিস্টরা সম্ভবপর সমস্ত সহায়তা করেছিলেন। এই কাজে তাঁদের আত্মোৎসর্গ ও অবিচল সংহতির কথা আমার স্মরণ করা উচিত। ১৯৩০ সালের শেষার্ধে, লন্ডনে আমার ছাত্রজীবনে, আমি কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়ি। সেই সময় আমি কমিউনিস্ট পার্টি অফ গ্রেট ব্রিটেনের নেতা হ্যারি পলিট, ব্র্যাডলে ও ক্লীমেনস দত্তের সংস্পর্শে এসেছিলাম। অসুস্থ রজনীপাম দত্তের (RPD) বাসভবনে তাঁকে দেখতে যাওয়ার স্মৃতি আজও আমার মন থেকে মুছে যায়নি। আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করার জন্য 'লন্ডন মজলিস' নামে একটি ছাত্র সংগঠনের সম্পাদকের পদে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। জওহরলাল নেহরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ভুলাভাই দেশাই ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো লন্ডনে ভ্রমণে আসা ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা আমাদের কাজের মধ্যে অন্যতম ছিলো।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে, কৃষকদের কৃষকসভায়, ছাত্র, যুব ও মহিলাদের তাদের সংগঠনে সংগঠিত করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। সারা ভারত কৃষকসভা (AIKS) ও সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন (AISF) এই প্রচেষ্টার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) আরও শক্তিশালী হয়েছিলো। সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সমিতি (AIPWA) ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ (IPTA) কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার কাজে একনিষ্ঠতা ও আত্মত্যাগের গৌরবজনক ভূমিকা আছে কমিউনিস্টদের। বিপ্লবীদের অধিকাংশকেই কমিউনিস্ট মতাদর্শের পক্ষে সমবেত করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বোৎকৃষ্ট ঐতিহ্যের ধারক কমিউনিস্টরাই ছিলেন।

পূর্ণ স্বরাজের দাবি ভারতের কমিউনিস্টরাই প্রথম তুলে ধরেছিলেন এবং ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তাঁরা এই মর্মে প্রস্তাব পেশ

করেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করার সাথে তাঁরা স্বরাজের স্লোগানকে প্রগতিশীল চরিত্র দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই লক্ষ্যে জমিদারতন্ত্র বিলোপ, সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করা, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের অবসান ও জাতি নিপীড়নের অবলুপ্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়নের আবশ্যিকতার ওপরও কমিউনিস্টরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নবগঠিত কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ শাসকেরা বর্বর দমনপীড়ন নামিয়ে এনেছিলো। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য কমিউনিস্ট পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট আন্দোলন চূর্ণ করার জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্র মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ১৯২২ সালে পেশোয়ার মামলা, ১৯২৪ সালে কানপুর মামলা ও ১৯২৯ সালে মিরাট মামলা। ১৯২০ সালে পার্টি গঠনের সাথে সাথেই তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। দুই দশকের বেশি সময় কমিউনিস্টদের আত্মগোপন করে কাজ করতে হয়েছিলো। জাতীয় রাজনীতিতে বক্তব্য রাখার জন্য তাঁদের যৎসামান্য সুযোগকে ব্যবহার করেছিলেন মিরাট মামলায় বন্দী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। আদালতের কাঠগড়া থেকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে তাঁরা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কর্মসূচীকে পুনরায় গতিশীল করতে। ভারতের বিভিন্ন অংশে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথমবার নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়গুলির ওপর মতবিনিময় করার এবং সাধারণ রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় আসার সুযোগ। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ফলে এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো। অবশ্য ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসের মধ্যবর্তী সময়ের আগে পুনর্গঠিত হবার প্রশ্নে গুরুত্ব সহকারে তেমন কোনো উদ্যোগ শুরু করা যায়নি। মীরাট মামলার প্রথম বন্দীর মুক্তির পরই এই প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৯৩৩ সালের শেষার্ধে একটি সর্বভারতীয় পার্টি কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

১৯৩৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সাথে সংযুক্ত সংগঠনগুলির ওপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের চাপিয়ে দেওয়া কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এইভাবে নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছিলো। যুক্তফ্রন্টের নীতি প্রয়োগ করার জন্য পার্টি ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলো। এই নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। পরে, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়েছিলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এই সময়কালে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতিপদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌয় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের

অধিবেশনে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে (AICC) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে ২টি গুরুত্বপূর্ণ সর্বভারতীয় সংগঠন — সারা ভারত কৃষকসভা ও সারা ভারত প্রগতিশীল লেখক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দুইটি সংগঠনেই কমিউনিস্টরা ছিলেন প্রধান পরিচালনা-শক্তি। এই সময়কালে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে যুক্তফ্রন্টের নীতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে সাহায্য করেছিলো। কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব বাড়তে থাকায় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে বিতাড়নের জন্য দক্ষিণপন্থীরা মরিয়া প্রচেষ্টা করে। কমিউনিস্টদের সমর্থনে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। শেষপর্যন্ত, সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক। কমিউনিস্টরা তাঁর সাথে যদিও এই প্রশ্নে একমত হননি এবং কংগ্রেসের প্রশস্ত ঐক্যবদ্ধ মোর্চারূপে বজায় থাকার পক্ষেই মত পোষণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণবিক্ষোভ বলশালী হয়ে উঠেছিলো। যদিও এখন সমীক্ষা করলে জনযুদ্ধ পর্বে পরিস্থিতির সঠিকভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ঘাটতির প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, তা সত্ত্বেও যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং হিটলারের জার্মানির নেতৃত্বে অক্ষশক্তি ইউ এস এস আর বা সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলো, তখন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অবদানকে আমরা যেন অবমূল্যায়ন না করি। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কলঙ্কিত করার জন্য চরম দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণকে আমাদের লড়াই করেই প্রতিহত করতে হয়েছিলো।

১৯৪৩ সালে বোম্বাইতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলো। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে, পুন্নাপ্রা-ভায়ালার কৃষক আন্দোলনে, উত্তর মালাবার ও ওরলীর আদিবাসী অভ্যুত্থানে, ত্রিপুরার উপজাতিদের জঙ্গী আন্দোলনে ও তেলেঙ্গানা সশস্ত্র সংগ্রামে। বহু করদ রাজ্যে জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন কমিউনিস্টরা

এবং ফরাসী ও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে পন্ডিচেরি ও গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কারাগারে বন্দী ১৯৪৬-এর ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের ও আই এন এ (INA) বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সংগ্রামের সমর্থন গণ-জমায়েত করার ক্ষেত্রে পার্টি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টকর্মীরা গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ শান্তি ও সম্প্রীতিবাণী প্রচার করতে কমিউনিস্টরাই জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে এসেছিলেন। নোয়াখালিতে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার পর, সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজী নিজেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং পরে নোয়াখালি গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে গান্ধীজীর সাথে দেখা করতে আমি ও ভূপেশ গুপ্ত বেলেঘাটায় গিয়েছিলাম। সেই দিনটির কথা আমার মনে আছে। মুসলিম ও হিন্দুদের যৌথ সমাবেশে সংগঠিত করার জন্য তিনি আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা তাই করেছিলাম। কিন্তু পার্ক সার্কাসের প্রথম সমাবেশ ভেঙে দেওয়া হলো। উত্তর চব্বিশ পরগনায় অনুষ্ঠিত সভায় আমি গান্ধীজীর সাথে গিয়েছিলাম।

ইউরোপে ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং এই পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করার ফলে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে ঐ সময়ে স্বীকার করতে হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সন্ধিক্ষণে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের দু'টি দল, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত হলো। দরকষাকষিতে বুর্জোয়া নেতারা দেশ বিভাগের ভয়ঙ্কর মূল্য দিতেও স্বীকার করলেন। এর ফলে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় প্রাণ হারালেন লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলিম। বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদারদের স্বার্থে ভারত ও পাকিস্তান, এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলো। মূলত, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সাধারণ জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের পর্যায় এইভাবে শেষ হলো।

ঐসব উত্তাল দিনগুলির কথা এখনও আমার মনে আছে। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে আমার আইন পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই আমি ভারতে ফিরে আসি। লন্ডন ছাড়ার আগেই আমি আমার মনকে তৈরি করে নিয়েছিলাম যে ব্যারিস্টার হবো না, সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করবো। কলকাতায়, সোভিয়েত সুহৃদ সঙ্ঘের (FSU) সম্পাদক হিসাবে আমি কাজ করেছিলাম এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ১৯৪৫ সালে পার্টি আমাকে পার্টির প্রাদেশিক কমিটির একজন সংগঠক (পি সি ও) হিসাবে কাজে নিযুক্ত করে।

১৯৪৪ সালের আগে, পার্টি আমাকে বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করার কাজ দেয়। বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করতে আমরা সফল হয়েছিলাম। আমি এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলাম, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি ছিলেন সভাপতি। পরে কমরেড মহম্মদ ইসমাইল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৬ সালে রেলওয়ে নির্বাচন ক্ষেত্রে থেকে হুমায়ুন কবীরকে পরাজিত করে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রবেশ করি। মাত্র তিনজন কমিউনিস্ট প্রার্থী সেবার নির্বাচিত হয়েছিল। এরা হলেন দিনাজপুরে কমরেড রূপনারায়ণ রায়, দার্জিলিঙ-এ কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণ ও আমি। মুসলিম লীগ ছিলো শাসক পার্টি। সংখ্যার দিক থেকে আমরা ছিলাম ক্ষুদ্র। তা সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিরূপে বিধানসভাকে ব্যবহার করার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এবং ঐ সময়ের জলন্ত বিষয়গুলি তুলে ধরার কাজে নিযুক্তি থেকেছি। অবশ্য জাতীয়স্তরেও পার্টি তখন এমন শক্তিশালী ছিলো না যে, দেশের ইতিহাসের ধারাকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। মুসলিম লিগের শাসনকালেই তেভাগা আন্দোলন বাংলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। আমি এই সংগ্রামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম।

স্বাধীনতার পরে

ভারতের স্বাধীনতার তাৎপর্য ছিল বহুমুখী। সমগ্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এই স্বাধীনতা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলো এবং বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলেছিলো। দেশের অভ্যন্তরে, এই স্বাধীনতা গুণগতভাবে এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছিলো শ্রমজীবী জনগণকে। স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা গৃহীত হলে সংসদ বহির্ভূত কাজের সাথে সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো পার্টি। অতিক্রান্ত বছরগুলিতে আমাদের দেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে নেতিবাচক ও ইতিবাচক, উভয়বিধ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে।

১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত বাম হঠকারী রণনীতি-রণকৌশলের লাইন ও সাংগঠনিক লাইন যে ভুল ছিল, এই সত্য স্বীকার করতে

আমার দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস আমাদের ওপর তীব্রতম আক্রমণ নামিয়ে আনে। আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও পার্টিকে দমনপীড়নের থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গসহ পার্টির সমস্ত শক্তিশালী অঞ্চলে পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। স্বাধীন ভারতে আমাদের অনেককেই বিনাবিচারে আটক করা হলো। এমনকি, বিধানসভার সদস্য (এম এল এ) হওয়া সত্ত্বেও আমাকেও বিনাবিচারে আটক করা হয়। সংবিধান গৃহীত হবার পর, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। একমাত্র তখনই আমাদের অনেকে মুক্তিলাভ করে।

অবশ্য, যে সংবিধান আমরা গ্রহণ করলাম তাতে শাসকশ্রেণীর দ্বিধাদ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখা যায়। সংবিধান ভারতকে 'সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' হিসাবে ঘোষণা করেছে। অথচ, প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রক্ষমতা বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীর হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। 'দেশ শাসনের মৌলিক ভিত্তি' হিসেবে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ঘোষিত হলেও, শাসক কংগ্রেস পার্টি এই আদেশ মেনে চলেনি। বিনাবিচারে আটক করাসহ অন্যান্য পীড়নমূলক আইন করার ক্ষমতা সরকারকে দিয়েছে সংবিধান। নির্বাচিত সরকারগুলিকে উৎখাত করা হয়েছে বহুবার সংবিধানের ৩৫৬নং ধারার বলে। এমনকি জরুরি অবস্থা জারি, যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারসহ সমস্ত অধিকার বিলুপ্ত করা হয়, সেটা করার সুযোগও এই সংবিধানের রয়েছে। অপরদিকে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এবং সম্পদের পুঞ্জীভবন বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। এর ফলে শহর ও গ্রামীণ এলাকা এই উভয়ক্ষেত্রেই শ্রেণী মেরুকরণের প্রক্রিয়া তীব্র হয়ে উঠছে।

সংবিধানের নেতিবাচক দিক ও পুঁজিপতি-ভূস্বামী প্রভাবান্বিত বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও জনগণের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, তা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা কখনও অগণতান্ত্রিক জনবিরোধী নিপীড়নমূলক আইন প্রণয়ন করিনি এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ঐসব অগণতান্ত্রিক ধারা কখনই প্রয়োগ করা হয়নি। মিসা (MISA) অথবা টাডা (TADA)-র মতন কালাকানুনের বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা আমরা সবসময়েই প্রকাশ করেছি।

বিকল্প নীতিসমূহ

কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্ন থেকে কমিউনিস্টরা ভারতের রাজনীতিতে প্রগতিশীল

ভূমিকা পালন করে চলেছে। বুর্জোয়া জমিদার সরকারের নীতিগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে বিকল্প নীতি নিয়ে বাম আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি। ১৯৫৭ সালে কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালায় বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত সরকারগুলি সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও গণমুখী বিকল্প নীতিগুলির রূপায়ণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পথ দেখিয়েছে। এই সরকারগুলি বর্তমান কাঠামোর মধ্যে ভূমিসংস্কার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বলশালী করেছে এই সরকারগুলি। দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উজ্জীবিত উপাদান এই সরকারগুলি।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠিত হয়। পার্টি যে কর্মসূচী গ্রহণ করে, সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামি সম্পর্কে উপলব্ধিকে ভিত্তি করে তা রচিত হওয়ায় পরবর্তী সময়ে রণনীতি ও রণকৌশলকে পার্টি দৃঢ়তার সাথে রক্ষা করেছে।

পার্টি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সি পি আই (এম) বুর্জোয়া জমিদার শাসনের ক্ষতিকর দিকগুলির বিরুদ্ধে গণজমায়েত করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিল্পে মন্দা, কাজের সুযোগের সঙ্কোচন ও ধারাবাহিক খাদ্য সঙ্কটের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম)-র নেতৃত্বে বামপন্থীরা শক্তিশালী ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। ১৯৬৬ সালে গণক্রোধের বিস্ফোরণ অভূতপূর্ব স্তরে উন্নীত হয়।

এই সঙ্কটকালে, ১৯৬৭ সালে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ৯টি রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। এই যুক্তফ্রন্ট সরকারে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি যৌথভাবে যোগদান করেছিলো। কিন্তু এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ৯ মাসের বেশি টিকতে দেওয়া হয়নি।

এতদ্‌সত্ত্বেও, তদানীন্তন কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি চক্রান্ত ও বর্বর অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলি প্রতিহত করে যুক্তফ্রন্ট ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনগণের বিশাল রায় নিয়ে পুনরায় সরকার গঠন করে। কংগ্রেস সরকারের আমলে অবলুপ্ত গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পুনরায় ফিরিয়ে দেয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। ভূমিহীন কৃষক, দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার ও গ্রামীণ গরিবদের অন্যান্য অংশের স্বার্থে ভূমিসংস্কার চালু করার লক্ষ্যে গুরুত্বপুর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিলো কলকাতা ট্রাম কোম্পানির ব্যবস্থাপনার অধিগ্রহণ। পূর্ববাংলা থেকে আগত বাস্তুহারাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো। প্রায় ৬০ লক্ষ বাস্তুহারা পূর্ববাংলা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে বাধ্য হয়েছিলো। পৌরসভা সংক্রান্ত নিয়মকানুন সংশোধিত করা হয়। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ঘাবড়ে দিয়েছিলো।

আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে ফ্রন্টের শরিকদের একটি অংশ ও কংগ্রেসী চক্রান্তের ফলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আরেকবার উৎখাত হতে হলো। পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন করা হলো। সি পি আই (এম)-কে সর্বাত্মক আক্রমণ করা হলো; দৈহিকভাবে আক্রমণও বাদ গেলো না। রাজ্যে কুখ্যাত আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস কায়েম করা হলো। রাজ্যের জনগণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলেও দুইটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য তারা কখনই সি পি আই (এম)-কে দায়ী করেননি। ১৯৭১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১১১টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে সি পি আই (এম)-র উত্থান হলেও, পার্টিকে সংবিধানের অধিকার অনুযায়ী সরকার গঠন করতে দেওয়া হলো না। একথা রাজ্যের জনগণ ভুলে যায়নি। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২৭৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ৫টি আসন প্রাপ্ত দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছিলো। এই অশুভ জোট অস্থায়ী হতে বাধ্য। বাজেট অধিবেশনের আগেই এই সরকারের আয়ু শেষ হয়ে যায়। ১৯৭২ সালে সাধারণ নির্বাচনে সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর গুরুতর আঘাত করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজশে ব্যাপক রিগিং ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হলো। ১৯৭১ সালের মতো রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য সশস্ত্র বাহিনী ডাকা হলো। নির্বাচন কমিশনার আমাদেরকে করার ব্যাপারে তার অসহায় অবস্থা প্রকাশ করলেন। নির্বাচনের আগে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে আমাদের এই আশঙ্কার কথা বলা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তা বাতিল করে দিয়েছিলেন।

স্বৈরতন্ত্রে ও উগ্র বাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সুখের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা হলো পশ্চিমবঙ্গকে। নৈরাজ্য ও শ্বেত সন্ত্রাসের মধ্যে রাজ্যকে ছুঁড়ে ফেলা হলো। হাজার হাজার পার্টিকর্মী ও সমর্থকদের বন্দী করা হলো। প্রায় ১১০০ পার্টিকর্মী ও সমর্থককে খুন করা হলো। দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হলো না। ১৯৭৫ সালে জরুরি

অবস্থা জারি করা হয়েছিলো। কিন্তু তার আগে থেকেই ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কবলে ছিলো পশ্চিমবঙ্গ। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর, দমনপীড়ন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বেঁচে থাকার অধিকার সহ সমস্ত স্বাধিকার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল। বিশাল সংখ্যক পার্টিকর্মী ও সমর্থনসহ আমাকেও বহুবার বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। ন্যায়সঙ্গত দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের রক্ষায় শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের আন্দোলনগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য বহু সংখ্যক মানুষকে তৈরি করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। এই নারকীয় পরিস্থিতিতেও জনগণের শত্রুদের কাছে আমরা কখনই মাথা নত করিনি। জনগণের ওপর আমরা আস্থা রেখেছিলাম। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর জনগণ কেন্দ্রে এবং পশ্চিমবঙ্গসহ বহু রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসকদের মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন।

ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে, জনগণকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে বেশিদিন দমিয়ে রাখা যায় না। বর্বর স্বৈরতন্ত্রকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করে সন্ত্রাসের অভিযানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিলো। এই আন্দোলন বাম ঐক্যকে নতুন করে মজবুত করে তুলেছিল। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধের প্রতিফলন ঘটলো ভোট বাক্সে। ১৯৭৭ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বহু অংশে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটলো। ঐ বছরই জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার দুই-তৃতীয়াংশ আসনে নির্বাচিত হয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো। অবশ্য, ১৯৮০ সালে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম গণতন্ত্রের অন্তর্ঘাতকারীরা, কেন্দ্রে আবার ক্ষমতা দখল করলো। এর কারণ জনগণের উপযুক্ত রাজনৈতিক ও আদর্শগত চেতনার অভাব। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য দেশের অধিকাংশ স্থানে আমরা, বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।

বামফ্রন্ট সরকার গঠন

১৯৭৭ সালে, বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছিলো জনগণের বিপুল সমর্থনে। পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হলো বামফ্রন্ট সরকার। আমার মনে আছে দায়িত্বভার গ্রহণের দিনে মহাকরণের সামনে জমায়েতে বিশাল জনতা আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। জনগণকে আমরা বলেছিলাম, শুধুমাত্রা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে আমরা প্রশাসন চালাবো না। আমাদের কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা জনগণের সাহায্য নেবো। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, শিক্ষক ও সমস্ত

অংশের সাধারণ মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াবো।

পশ্চিমবঙ্গে প্রগতিশীল ভূমি সংস্কারের উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছিলাম এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৩ লক্ষ একরের বেশি জমি বিতরণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীর হাতে শতকরা ৮৪ ভাগ কৃষি জমি আছে। এই কর্মসূচী এখনও অব্যাহত আছে। গরিব মানুষকে জমি বিতরণ করছে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। আদালতে মামলার জন্য এক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। কৃষির বিকাশ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থায় ও পৌরসভার নির্বাচনে বয়সসীমা ১৮ বৎসর করা— এইসব বিষয়গুলির উপর আমরা জোর দিয়েছিলাম। বর্তমানে গ্রামীণ ও শহরী স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় করা হয়। কৃষি উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। সামাজিক বনসৃজন ও মৎস্যচাষে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গরিব মানুষ, কৃষি মজুর ও বর্গাদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত।

ভূমিসংস্কার রূপায়ণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেণি শক্তিগুলির অন্তঃসম্পর্কে পরির্তন শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে হয়েছে। এই পরিবর্তন সাহায্য করেছে গ্রামীণ অর্থনীতি প্রশংসনীয় বৃদ্ধির সাফল্য অর্জন করতে। প্রতি বছর শিল্পদ্রব্যের জন্য ২০,০০০ কোটি টাকার বাজার গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়েছে। এর বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৮ ভাগ, যা সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য অনুসারে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ ছিলো দারিদ্র্যসীমার নিচে। বর্তমানে তা কমে এসেছে ২০ শতাংশে। এটা নিংসন্দেহে একটি রেকর্ড। কর্মসংস্থানের সুযোগ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও, বেকারি এখনও গুরুতর সমস্যা। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (SDP) বৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশে পৌঁছেছে।

শিল্পক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়ানো

কৃষি ও অনুসারী ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যৌথ প্রভাব, অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্রমাগত বৃদ্ধি, জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি, রাজ্যের অবস্থানগত সুবিধা, দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের প্রাচুর্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি,

সামাজিক স্থিতিশীল অবস্থা ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাব— এসবই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স প্রথা, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মাসুল সমীকরণ নীতির ফলে ১৯৭০ ও ১৯৮০'র দশকে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের উৎকৃষ্ট ঐতিহ্যসম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি দারুণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস ও বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে ইচ্ছাকৃতভাবে বছরের পর বছর লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। এটাই কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণের জ্বলন্ত প্রমাণ। রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিকাশের পথে এই ধরণের বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকার জোরালো প্রতিবাদ করেছিলো। এই বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অধোগতি রোধ করতে পারেনি।

অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু নীতিগত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাপের মুখে লাইসেন্স প্রথা ও মাসুল সমীকরণ নীতি বাতিল করা হয়। বিশ্বায়ণ ও বিশ্বব্যাঙ্কের নীতিগুলি ভারত গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশিত জনবিরোধী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য নীতিগুলির কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসমর্পণ ও স্বনির্ভর বিকাশের মূল নীতিতে আপস করার বিরুদ্ধে দেশে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বে আছেন বামপন্থীরা।

নতুন পরিস্থিতির পটভূমিতে , পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে শিল্পায়নের কর্মসূচীকে পরিবর্তিত করতে হয়। লাইসেন্স প্রথা বাতিল ও মাসুল সমীকরণ নীতির প্রত্যাহারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের স্বার্থে কিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালে আমাদের নতুন শিল্পনীতির দলিল বিধানসভায় পেশ করা হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির অভিমুখসহ রাজ্যের অর্থনীতিকে বিকাশে সাহায্য করতে পারে এই ধরণের নতুন প্রযুক্তি ও লগ্নিকে উৎসাহিত করে শিল্পায়নের জন্য এক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী প্রনয়ণ করে বামফ্রন্ট সরকার।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ত্বরান্বিত ও জনগণের অয় বৃদ্ধি করার মৌলিক উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের গৃহীত এই নীতির ঐকান্তিক রূপায়ণের ইতোমধ্যেই ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাচ্ছে। দেশের শিল্পায়নের চালচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কৃষিক্ষেত্রে যে সাফল্য রাজ্য ও জনগণ অর্জন করেছে— তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, যদি না শিল্পায়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় (Secondary) এবং তৃতীয় (Tertiary) পর্যায়ের ক্ষেত্রে

ভারসাম্যমূলক বিকাশ প্রক্রিয়া এখনই শুরু না করা যায়, বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত নীতি এই দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র এই পথেই কৃষির উপর শ্রমশক্তির ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে পারে। প্রয়োজনীয় সংযোজন করে প্রাথমিক ক্ষেত্রের আরো স্থিতিশীল বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে পারে এই পথ। এইভাবেই আয় এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান বাড়ানো যেতে পারে।

১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই আমি রাজ্য বিধানসভার সদস্য। আমার ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম একই সাথে চলেছে। বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আমি বহু বছর কাজ করেছি। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-৭০ সালে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলাম। ১৯৭৭ সালে আমি মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়ে একটানা ২৩ বছর বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে ছিলাম। ২০০৬ সালে টানা সপ্তম বারের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটা একটা রেকর্ড।

বামফ্রন্ট সরকার ৩০ ববছর অতিক্রম করেছে। রাজ্যের হাতে সীমিত ক্ষমতা, বেশিরভাগ সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক মনোভাব এবং মিথ্যা ও অর্ধসত্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের পার্টি ও সরকারের কলঙ্কিত করার জন্য সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন মহলের ধারাবাহিক অপচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকারের ৩০ বছর থাকা মোটেই কোন ছোট সাফল্য নয়। কিন্তু এই একটানা থাকা শুধুই রেকর্ড ভাঙার ঘটনা নয়, বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী এবং কাজই এই ৩০টি বছরের গভীরতা এবং তার তাৎপর্যকে চিহ্নিত করেছে উন্নয়ন এবং সংগ্রামের এক অভিনব অধ্যায়ে। সারা দেশের অভিজ্ঞতা হলো এই যে, আমাদের নীতির জন্যই আমরা প্রতিটি নির্বাচনে মানুষের ধারাবাহিক এবং দৃঢ় সমর্থন পাচ্ছি। তথাকথিত প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব আমাদের রাজ্যে কাজ করে না। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ এভাবে ইতিহাস রচনা করে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

আমরা যখন সরকারে ছিলাম না, তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের এক দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক বিরোধীপক্ষ হিসাবেই দেখেছেন। আমরা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে কখনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিনি; রাজ্যের মানুষের স্বার্থজনিত কোন কাজেও আমরা সমস্যা তৈরি করিনি। আমি কেরালার অভিজ্ঞতাও উল্লেখ করতে চাই যে, সেখানে ১৯৫৭ সালে প্রথম কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। বিধানসভাতে

আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই সরকারকে বরখাস্ত করেন। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তামিলনাড়ুর ত্রিচি শহরে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি সভায় উপস্থিত সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিনা বিচারে আটক করা হয়। শুধু আমাকে এবং ই এম এস-কে ওরা গ্রেপ্তার করেনি। কেরালা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক গ্রেপ্তার চালানো হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে ব্যাপক কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার চালাতে থাকে। কেরালাতে ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আমরা যাতে জিততে না পারি, তারজন্যই মরিয়া উদ্যোগ নিয়েছিলো তারা। এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের পার্টি বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি আসন পেলো, অনেকেই জেলে থাকাকালীন অবস্থাতেই নির্বাচিত হলেন এবং বিধানসভায় আমাদের পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। গণতন্ত্রের পক্ষে কেরালার জনগণের এটা অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য অবদান। কিন্তু যেহেতু কোন সরকার গঠন করা গেলো না, তাই বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হলো এবং রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হলো। ১৯৬৭ সালে, আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং কংগ্রেসকে পরাস্ত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো।

বামপন্থীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট রাজ্য ত্রিপুরাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছে এবং বাঙালী ও উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। এটা অবশ্যই একটা বড় সাফল্য। বাঙালীরা ব্যাপকভাবে আসার পরে এই রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। তা সত্ত্বেও সি পি আই (এম) বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্যে ঐক্য গঠন করতে সমর্থ হয়।

গণতন্ত্র রক্ষায়

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে গণতন্ত্র সম্বন্ধে শিখেছি এবং ভারতীয় রাজনীতিতে গণতন্ত্রের বাস্তবতার সাথে আমাদের নীতি খাপ খাইয়ে নিয়েছি। স্বাধীনতার ঠিক পরেই আমাদের সন্দেহ ছিলো যে রাজ্যগুলিতে আমাদের সরকার গড়ার কোন স্বাধীনতা আমরা আদৌ পাব কিনা, কেন্দ্র তো দূরের কথা। কিন্তু ১৯৫৭ সালে কেরালাতে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠন হওয়ার পর আমরা বামপন্থী দলসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোকে সাথে নিয়ে রাজ্যে সরকার গঠন করার সম্ভাবনার বিষয়টিকে আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করি। কিন্তু আমরা কেন্দ্রে এ ধরনের সরকারের কথা চিন্তা করিনি। পরবর্তীকালে এমন পরিস্থিতি যখন হলো আমরা বাইরে থেকে, তিনবার, অকংগ্রেসী

সরকারকে কেন্দ্রে সমর্থন জানিয়েছি। ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার যাকে আমরা সমর্থন জানিয়েছিলাম, কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেসের সমর্থন পেয়েছিলো, যখন বি জে পি-র মতো বিপজ্জনক দলের উত্থান ঘটেছিলো। অবশ্য, পরে কংগ্রেস বি জে পি-র সুবিধা করে দিয়ে দায়িত্বহীনভাবে সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলো। ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্টের নেতারা সি পি আই (এম)'কে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং তারা এই সরকারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দু'বার এই বিষয়ে সভা করেছিলো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কেন্দ্রের সরকারে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তী পার্টি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলো। অবশ্য, বাস্তব অবস্থায় বিবেচনায়, কর্মসূচীতে আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে '.... পার্টি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে অথবা কেন্দ্রে এই ধরনের সরকার গঠনের সুযোগ গ্রহণ করেও বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান বুর্জোয়া - জমিদার রাষ্ট্র এবং সরকারের অপসারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে ব্যাপকতম জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে থাকবে এবং এর দ্বারা গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।' (পার্টি কর্মসূচী : ৭-১৭ ধারা)।

এই সিদ্ধান্ত একটা কৌশলগত প্রশ্ন, যা বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে যাতে আমাদের দেশ ও জনগণের সুবিধা হয়।

আমরা আমাদের কর্মসূচীতে পুনরায় বলেছি যে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জনগণতন্ত্র, যার পর হবে সমাজতন্ত্র- শ্রেণীহীন এবং শোষণহীন সমাজ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সংবিধান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার যা আমাদের সংবিধানে সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাসহ সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলি সুরক্ষিত রাখার জন্য জনগণ যেন সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখেন আমরা সেই আহ্বান জানাই।

আমরা জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্য পুরণের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচেষ্টা চালাব। অবশ্য, ইতিহাস বারবার এটা দেখিয়েছে যে, মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের স্বার্থরক্ষার প্রতিনিধিত্বকারী শাসকশ্রেণী, কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে যায় না এবং জনগণের ইচ্ছাকে অমান্য করে।

আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষই ইতিহাস রচনা করেন এবং তাঁদের উপরে আমাদের গভীর আস্থা রয়েছে। মানুষ কখনও কখনও ভুলও করেন, কিন্তু সমস্ত ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞতা, অগণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইতে মানুষই শেষ পর্যন্ত সঠিক পথ গ্রহণ করেন। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

আমি আবার বলতে চাই, আমরা বিশ্বাস করি যে, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের সংবিধান হচ্ছে এমন একটা দলিল যা মানুষের অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করাযেতে পারে। কিন্তু জনগণের অভিজ্ঞতা ও চাহিদার বিবেচনায় এর পরিবর্তনও প্রয়োজন। এটা আনন্দের বিষয় যে, ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।

সংসদীয় এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের স্বার্থে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি এবং সংসদের বাইরের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত করে দক্ষতার সাথে এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। জনগণের চেতনা বৃদ্ধির জন্য আমাদের এমনভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং জনগণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা— শোষণহীন এবং শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হন। আমার ৬৭ বছরের রাজনৈতিক জীবনের পর এটা অনুভব করে আমি সন্তুষ্ট যে, ভারতের জনগণ বারবার প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছেন।

ইউ পি এ সরকারের প্রতি সমর্থন

সি পি আই (এম) জাতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে, পার্টি রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতি এবং কংগ্রেস সরকারগুলির বিরুদ্ধে ৪৫ বছর লড়াই করার পর আমরা অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে একসাথে কেন্দ্রে কংগ্রেসের পরিচালিত ইউ পি এ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছি, যাতে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যায়। বি জে পি জোটকে খারিজ করে জনগণের রায়ের পর, এটা দেখা জরুরি ছিল যাতে বি জে পি ফিরে আসার কোন সুযোগ না পায়। কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র এবং উদারিকরণের অর্থনৈতিক নীতিকে রূপায়ণে তাদের দায়বদ্ধতার কথা বিচেনা করে আমাদের পার্টি সরকারে যোগদানের পক্ষে ছিল না। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা বাইরে থেকে কংগ্রেসের

নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারকে সমর্থন জানাবো, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাকে নিশ্চিত করা যায়। পার্টির কেন্দ্রীয় কাজ ছিল বি জে পি-কে বিচ্ছিন্ন করা ও পরাস্ত করা, যাতে বি জে পি পরিচালিত সরকারকে কেন্দ্র থেকে অপসারণ করা যায়। পার্টি এবং বামপন্থী শক্তিগুলি, বি জে পি পরিচালিত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে জমায়েত করার কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বি জে পি'র সাম্প্রদায়িক জোট, তাদের সাম্রাজ্যবাদপন্থী এবং জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি, নজিরবিহীন দুর্নীতি-কেচ্ছা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার ও সংগ্রামই এই জোটকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে সাহায্য করেছে। শ্রমিকশ্রেণী এবং খেটে -খাওয়া মানুষের অন্যান্য অংশকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-সংগঠনগুলো যে সংগ্রাম করেছিল, বি জে পি-কে বিচ্ছিন্ন করার কাজে তার অবদান আছে। আমাদের পার্টি একটা নির্বাচনী কৌশলগত লাইন গ্রহণ করেছিল যা বি জে পি ও তার জোটকে পরাস্ত করে, কেন্দ্রে একটা বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করে এবং সংসদে পার্টি ও বামপন্থীদের প্রতিনিধিত্ব শক্তিহালী করার জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল।

সি পি আই (এম) এবং অন্য বামদলগুলি, সরকার পরিচালনার জন্য ইউ পি এ'র সভায় গৃহীত সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীকে ব্যাপক অর্থে অনুমোদন করেছে। যদিও উদারীকরণের নীতির মৌলিক বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করতে পারবে না, তাসত্ত্বেও সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা প্রয়োগ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার কাজে সাহায্য হবে, কৃষিক্ষেত্রে জনগণের কিছুটা সুরাহা হবে এবং কর্মসংস্থান হবে। এই কর্মসূচী প্রয়োগ হলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যেরও কিছু চাহিদা পূরণ করা যায়। বিগত সরকারের অন্ধ আমেরিকামুখী বিদেশনীতি কিছু সংশোধনের কথাও কর্মসূচীতে আছে। সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীতে স্বাধীন বিদেশনীতির কথাও বলা হয়েছে।

নির্বাচনে জনগণের রায় এবং ভালো কিছু পাওয়ার জন্য তাঁদের প্রত্যাশার একটা প্রভাব পড়েছিল। আমরা কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের কাজের কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের মতবিরোধের কথা জানিয়েছিলাম। সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীতে বর্ণিত যেকোন জনস্বার্থবাহী পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করলে আমরা তা সমর্থন করব। অবশ্য, জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপের স্পষ্ট বিরোধিতা করার বিষয়ে আমাদের কোন দ্বিধা নেই। সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী থেকে সরে এসে পূর্বতন সরকারের নীতিই

চালিয়ে যাওয়া, তা সে অর্থনীতির ক্ষেত্রে হোক বা বিদেশনীতির ক্ষেত্রেই হোক, আমরা তার বিরোধিতা করব। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি, যাতে দেশের স্বাধীন বিদেশনীতি এবং স্বনির্ভরতার সাথে আপস করতে হবে, আমরা তা গ্রহণ করতে পারব না বলে জানিয়ে দিয়েছি।

সমস্ত রাজনৈতিক এবং অন্যান্য নীতির বিষয়ে সি পি আই (এম)-র হস্তক্ষেপ দৃশ্যতই বেড়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, নয়া উদারনীতির বিরোধিতা করে জনগণের স্বার্থকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে পার্টির ধারাবাহিক ভূমিকা জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমর্থন আদায় করতে পেরেছে। আমাদের পার্টি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালাচ্ছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চাপের বিরুদ্ধে ও স্বাধীন বিদেশ নীতির সপক্ষে সংগ্রামে পার্টি সবসময়ই প্রথম সারিতে রয়েছে। এরফলে, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য অনেকেই যারা সাধারণ বামপন্থীদের সমর্থন করেন না, তাঁদের মধ্যেও এই কাজের ব্যাপক স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে।

আমি কংগ্রেস দলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, তাঁরা যেন তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনীতির বিষয়ে আত্মসমালোচনা করেন। দল হিসাবে কংগ্রেস একটা ধর্মনিরপেক্ষ দল, কিন্তু তাঁরা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য জনগণকে জমায়েত করার ক্ষেত্রে করণীয় কাজ করেন না। তাঁরা এমনকি হিন্দু ও মুসলিম উভয় মৌলবাদী শক্তির সাথে আপস করেন। অযোধ্যা ইস্যু এবং শাহবানু মামলা হলো এর উদাহরণ। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার সময় গেরুয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে সময়মতো পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাওয়ের ব্যর্থতার কথা সবাই স্মরণ করতে পারবেন। আমরা তাঁকে বি জে পি/ আর এস এস-কে বিশ্বাস করার বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু তিনি তাদের উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় সারা বিশ্বে দেশের সম্মান অনেক কমে গিয়েছে।

পার্টি বৃদ্ধির জন্য কাজ

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সারা দেশে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির অসম বিকাশ ঘটেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এই অসমতা

রয়েছে। কিন্তু একটা যোগ্য বিকল্প উপস্থিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত। এটা দেখে বেশ ভালো লাগছে যে, জনগণের বিভিন্ন অংশ ব্যাপক সংগ্রামে শামিল হচ্ছেন।

এই আন্দোলন সংগ্রামকে সঠিক পদনির্দেশ দিতে হবে, সঠিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজ করতে হবে, আমরা আমাদের পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে ইতোমধ্যেই এবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

এখন আমাদের দেশজুড়ে প্রচার চালানো প্রয়োজন এবং বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালাতে আমরা যে কাজ করেছি তা মানুষকে জানাতে হবে। এই রাজ্যগুলোতে আমরা কিভাবে বিকল্প কর্মসূচী প্রয়োগ করেছি তা দেশের মানুষকে বলতে হবে। আমাদের এই প্রশ্নও তুলতে হবে যে, এত ব্যাপক সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক- রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা যে কাজ করতে পেরেছি, অন্য রাজ্যগুলো তা করতে পারেনি কেন?

আমরা পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরা ও কেরালাতে অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলবাড়ুর মতো রাজ্যেও আমাদের সংগঠন শক্তিশালী। আরও বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা সংহত করতে পার্টি কতগুলো রাজ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছে— আসাম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র। শক্তিশালী রাজ্যগুলো যাতে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোকে তাদের সংগঠন বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করতে পারে, সেই লক্ষ্যে সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের গণসংগঠনগুলোকেও শক্তিশালী করতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের গণ-সংগঠনগুলোর সদস্য সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু 'অগ্রাধিকার রাজ্যগুলোতে' আমাদের বৃদ্ধির বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গণ-সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী না করে সারা দেশে শক্তিশালী পার্টি গঠন করতে আমরা পারব না। নতুন নতুন অঞ্চলে এবং জনগণের নতুন নতুন অংশে পার্টি ও গণ-সংগঠনগুলোর বৃদ্ধি খুব জরুরি। আরও বেশি বেশি মানুষ আমাদের পার্টির দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন। একটা তৃতীয় বিকল্প গড়তে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার রাস্তা খুলতে আমাদের পার্টিকে একটা সর্বভারতীয় শক্তি হিসাবে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আমরা আন্তরিকভাবে এই কাজ করার চেষ্টা করছি।

আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, তা আমাদের ব্যবহার করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হল, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং এই লক্ষ্যপূরণে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যদিও আমি জানি না এর জন্য কত দীর্ঘ সময় লাগবে। একজন কমিউনিস্ট হিসাবে আমি একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সবসময় আশাবাদী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ, তাঁদের স্বপ্ন অবশ্যই পূর্ণ হবে।

গণশক্তি শারদ সংখ্যা - ২০০৭